বঙ্গদেশীয়দিগের বংশ আবার যে বলিষ্ঠ হইয়া পৃথিবীর বীর জাতির সহিত সমকক্ষতা করিতে পারিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখন শিক্ষিতদিগের মধ্যে অনেকেরই বলবীর্য্য ও স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু যত দিন না বল্লালকৃত সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে বদ্ধ বৈবাহিক দোষটুকু উন্মূলিত হইতেছে তাবৎ তাঁহারা বলবার্য্য লাভের নিমিত্ত যা কিছু করুন কোনও মতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

এ বিষয়ে আরও একটু বক্তব্য আছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মে মর্ম্মে সর্ব্বত্র সাম্যের কথা পাওয়া যায়। এক সময় সমাজবন্ধন ও সামাজিক উন্নতি সাধনের নিমিত্ত বর্ণবিভাগের বিশেষ আবশ্যকতা হইয়াছিল। এবং ইহার দ্বারাই সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু এই বর্ণবিভাগ থাকিলেও বিবাহের কোন ব্যাঘাত ছিল না এবং এতন্নিবন্ধন বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে একটা সাম্যও রক্ষিত হইত। কালসহকারে এই বিবাহ রহিত হইয়া যায়। এখন হিন্দুসমাজের যেরূপ ভাবগতি তদ্দৃষ্টে ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যায় যে বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে বিবাহের পুনঃপ্রবর্ত্তনার এখনও সময় আইসে নাই, কিন্তু বর্ণবিভাগের মধ্যে এই অবান্তর শ্রেণীবিভাগ ভাঙ্গিবার ঠিক্ সময় হইয়াছে। অনেকেই বুঝিয়াছেন ইহারই দ্বারা সমাজের অনেক অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। অতএব যাহাতে বর্ণের মধ্যে এই অবান্তর বিভাগ নষ্ট হয় তদ্বিষয়ে সহৃদয় মাত্রেরই একটু চেষ্টাবান হওয়া আবশ্যক। এই অবান্তর বিভাগের জন্য বর্ণের মধ্যে একটী বৈরবীজ বহুকাল হইতে পুষ্ট হইয়া আসিতেছে। ইহা দ্বারা কেবল যে সমাজের অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা নহে কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত হইতেছে। কারণ এই ধর্ম্মের মূলমন্ত্র সর্ব্বত্র সাম্য। এস্থলে সংস্কারকদিগকে একটা কথা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সমাজসংস্কার একটা স্বতন্ত্র কার্য্য নয়। ইহার জন্য আড়ম্বর ও উপদ্রব করিয়া বেড়াইলে কখনও সমাজের কোনও উপকার হইবে না। অগ্রে ধর্ম্মরক্ষায় যত্ন কর। সমাজ-সংস্কার ইহারই আনুসঙ্গিক ফল। তদ্ব্যতীত ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে সমাজ-সংস্কারের নামে এমন সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে যাহার সহিত ধর্ম্মের কোন কালে কোন সম্বন্ধ নাই। সমাজের বক্ষে একটা উপদ্রব আনয়ন ব্যতীত তাহার ফল আর কিছুই নহে। ফলত ভবিষ্যতে যদি কোনরূপ সংস্কার আবশ্যক হয় এই বর্ত্তমান বিভীষিকা তাহার ঘোর প্রতিবন্ধক হইবে। অতএব তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

এক্ষণে আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি হিন্দুসমাজের স্থিতিশীলতা-দোষ অপনীত হইবার উপক্রম হইয়াছে। রাঢ়ীয় শ্রেণী, সপ্তশতীদিগের সহিত মিশিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ব্বাঞ্চলের কোন কোন সম্ভ্রান্ত লোক কৌলীন্যের উচ্ছেদ সাধনে যত্ন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত সম্প্রতি আরও একটী শুভাবহ ব্যাপার ঘটিয়াছে। ইহা শ্রেণীভঙ্গ। ইহার পথ-প্রদর্শক শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ রাজা আদিশূরের যজ্ঞসাধনার্থ গৌড়দেশে আইসেন তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কবি ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্য বংশের প্রবর্ত্তক। শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ ভট্টনারায়ণের অধস্তন ষট্‌ত্রিংশ পুরুষ। ইনি রাঢ়ীয় শ্রেণী। গত ৩০ শ্রাবণে ইহাঁর পৌত্রী শ্রীমতী প্রতিভা দেবীর সহিত কৃষ্ণনগরের একজন জমিদার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরীর বিবাহ হইয়াছে। ইনি বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ। কিছু দিন হইল

ইনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এ, উপাধি লাভ করিয়া স্বদেশে আসিয়াছেন। পাত্রী সুশিক্ষিতা পাত্র উচ্চ-শিক্ষা-প্রাপ্ত। এই মিলন যে বহুকল্যাণকর হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের বিদ্যা বুদ্ধি অর্থ ও জীবন দিয়া এ দেশের সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ইনি সমাজতত্ত্বজ্ঞ বিচক্ষণ ও দেশকালদর্শী। সমাজসংস্কার ইহাঁর ধর্ম্মরক্ষারই আনুসঙ্গিক ফল। ধর্ম্মরক্ষা করিতে গিয়া যতটুকু সংস্কার আবশ্যক তদ্বিষয়ে ইহাঁর বিশেষ দৃষ্টি আছে। ইনিই মহারাজ বল্লালের ৮০০ শত বৎসর পরে এই শ্রেণীবিভাগ ভাঙ্গিবার সূত্রপাত করিলেন। এখন বঙ্গদেশে বাস্তবিক যাহা অভাব এই মহাত্মা হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে তাহা অনুভব করিয়াছেন এবং নিজেই তৎসংস্কারের পথ-প্রদর্শন করিলেন। রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমির ভ্রাতারা সমস্ত ব্যবধান দূর করিয়া এত দিনের পর একহৃদয় একপ্রাণ হইল, এবং বহু দিনের পর কবি ভট্টনারায়ণের এক বংশধর হইতে এই বিবাদ সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া গেল।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্যের ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।

বিংশ ব্যাখ্যান।

ঈশ্বর মহান্, সুখের নিদান, তিনি বিনা যত আর।
বিপুল ভবন, যশোমান ধন, নহে নহে সুখ সার॥

যাবে যদি জীব! অমৃতের ধাম।
সংসার তরিতে যদি তব কাম॥
তাঁহার চরণ লও হে শরণ।
তাঁহারে অর্পণ করহ জীবন॥
উজ্জ্বল করিয়া জ্ঞানের নয়ন।
তাঁহারে হৃদয়ে করহ দর্শন॥
দেখ তাঁর বশে ফেরে গ্রহগণ।
বিতরিছে কর সুধাংশু তপন॥
নদ নদী সব হয় প্রবাহিত।
বরষার বারি করে নানা হিত॥
বসুন্ধরা ফল ফুলে সুশোভন।
তাঁহার জগৎ সুন্দর কেমন॥
জগতে যাঁহার মহিমা প্রচার।
জীবে যাঁর দয়া করুণা অপার॥
তিনিই তোমার হৃদয়ের ধন।
তাঁর কাছে যেতে বলেন বচন॥
তিনিই ঈশ্বর, তিনিই মহান্।
মুক্তিদাতা তিনি সুখের নিদান॥
তাঁহারে জানিতে, তাঁহারে সাধিতে,
তাঁর সুধা নাম প্রচার করিতে,
হয় নাই তব জনম এ ভবে?
তাঁর প্রতি তুমি উদাসীন রবে?
যে কিছু তোমার—সব যাঁর দান,
তাঁহারে করিবে তুমি প্রত্যাখ্যান?
তিনি স্বাধীনতা দিলেন তোমারে।
আপন ইচ্ছায় ভজিবে তাঁহারে॥
সেই তাঁর ইচ্ছা করহ পালন।
প্রেমে তাঁর পথে করহে গমন॥
প্রেমে তাঁর গলি কর কায তাঁর।
এই তব কায—নাহি অন্য আর॥
কেন ক্ষুদ্র ভাবে হইয়া মগন,
দিবানিশি অশ্রু করিছ বর্ষণ?
ভবের ভাণ্ডারে হেন দ্রব্য নাই।
আত্মার পিপাসা যাতে মিটে ভাই॥
অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র এ সংসার।
দিতে পারে সুখ গভীর অপার?
আত্মা তাই দেখ শুধু তাঁরে চায়।
যশোমান ধনে তৃপ্তি নাহি পায়॥
মরীচিকা সম সুখের ছলনে,
কেন ধাও তবে বিষয় পিছনে?
এক বিন্দু জল তাহে না মিলিবে।
আত্মার পিপাসা যাহে নিবারিবে॥
বিষয় অর্জ্জন, বিষয় রক্ষণ,
বিষয় বর্দ্ধন, বিষয় চিন্তন,

বিষয় সম্পদ্, আত্মার অন্তরে।
নাহি দেয় সুখ একদিন তরে ॥
ক্ষণে হর্ষ শোক ক্ষণে ভয় আশা।
আশায় নিরাশা আবার পিপাসা ॥
ক্ষণে প্রলোভন ধর্ম্ম কাড়ি লয়।
দুঃখের দুর্দ্দিন অন্ধকার ময় ॥
এইত গতিক সংসারের হয়।
শান্তির নিবাস কভু ইহা নয় ॥

মূঢ় মোরা তাঁর পথে নাহি যাই।
প্রবৃত্তির পথে আগে মোরা ধাই ॥
আগে সংসারের পথে প্রবেশিয়া।
গহন মাঝারে পথ হারাইয়া ॥
কণ্টক ফুটিয়া হয়ে জ্বালাতন।
তবে ফিরে যেতে করি আকিঞ্চন ॥
পথ নাহি পাই, দেখি তারিবার।
তিনিই কাণ্ডারী, নাহি কেহ আর ॥
সৌভাগ্য তাহার, এ হেন সময়ে।
ডাকে দয়াময়ে কাতর হৃদয়ে ॥
বলে "কোথা নাথ! অনাথ শরণ!
অগতির গতি, পতিত পাবন!
বিপথে পড়েছি কর হে উদ্ধার।
লয়ে যাও এবে সুপথে তোমার ॥
অঙ্গ হ'ল ক্ষত সংসারের ঘায়।
জুড়াও লইয়া চরণ-ছায়ায় ॥
আসিয়াছিলাম তৃষ্ণা নিবারিতে।
না জানিয়া ভ্রমে গোষ্পদ-বারিতে ॥
ক্ষাম-কণ্ঠ এবে কাতর পরাণ।
অমৃতের বিন্দু তুমি কর দান ॥"
যে কাতরে তাঁরে ডাকে এক চিতে।
সংসার সাগরে তাহারে তারিতে ॥
কৃপা-হস্ত দিয়া তারে তুলি ল'ন!
কাটি দেন তার মায়ার বন্ধন ॥
যে চায় তাঁহারে অমৃতের বিন্দু।
পিয়ান তাহারে সেই কৃপা-সিন্ধু ॥

পরীক্ষা করিয়া দেখহ সংসার।
অমিশ্র সুখের নহে এ আগার ॥
কয় দিন হেরে নর সুখ মুখ?
সুখের পিছনে উকী মারে দুখ।
দুঃখেতে পড়িয়া আশা করে সার।
সে আশায় ছাই পড়ে কতবার ॥ *
হেথা শোক তাপ কতই যন্ত্রণা।
কত অত্যাচার কতই লাঞ্ছনা ॥
বন্ধু বলি যারে বুকে দিই ঠাঁই।
কভু তার কাছে শেলাঘাত পাই ॥
সংসার নহে ত সুখের আলয়।
হেন করিলেন—যিনি দয়াময় ॥
অবিচ্ছেদ সুখ পাইলে হেথায়।
পাছে জীব আর তাঁরে নাহি চায় ॥
করেন সুখেতে কণ্টক যোজন।
দুঃখ কশাঘাতে আত্মার শোধন ॥
বিষয় আশার না হয়ে সুসার।
জানিবে সংসার নাহি হয় সার ॥
সংসার পরীক্ষা শিখিবার স্থান।
ইথে থাকি জীব লভিবেক জ্ঞান ॥
দুঃখেতে পুড়িয়া শ্যামিকা ত্যজিবে।
তাঁর পানে চাহি অটল থাকিবে ॥

ঈশ্বরের ইচ্ছা সংসারে থাকিয়া।
প্রবৃত্তির সহ সংগ্রাম করিয়া ॥
তাঁর দিকে ক্রমে হ'ব আগুয়ান।
তাঁর বলে ক্রমে হ'ব বলীয়ান ॥
সংসার মায়ায় আর না মজিব।
হৃদয়ের স্বামী তাঁহারে করিব ॥
কিন্তু রিপুসহ সংগ্রাম করিতে।
দুঃখ প্রলোভন শতেক সহিতে ॥
হীন-বল মোরা কেমনে পারিব?
দুর্ব্বলের বল তাঁহারে ডাকিব।
রে আত্মন্! তাঁরে করহ নির্ভর।
তিনি বল দেন বলের আকর ॥
সম্পদ মলয় যখন বহিবে।
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহারে স্মরিবে ॥
বহিলে বিপদ ঝটিকা ভীষণ।
তাঁর কাছে গিয়া লইবে শরণ ॥

---

* কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "ভগ্ন হৃদয়ে" ইহার অনুরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—
"সুখের মুখেতে থাকে দুখের কালিমা।
দুখের হৃদয়ে জাগে সুখের প্রতিমা ॥"

তিনিই আশ্রয় দিবেন তোমারে।
তিনি বিনা আর কেবা দিতে পারে?
দেখ বিহঙ্গম দুই পক্ষে ভর।
করিয়া উঠিছে আকাশ উপর॥
সুখ দুঃখ উভে করিয়া আশ্রয়।
তাঁর দিকে যেতে করহ নিশ্চয়॥
সম্পদ্, সৌভাগ্য, দুঃখ, অশ্রু-জল।
সবে যেন হয় আত্মার মঙ্গল॥

ক্রমশঃ।

সমালোচনা।

বিদ্যাবতী আবিয়ার ও তাঁহার উপদেশ। শ্রীযুত বাবু নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত। মূল্য /০ আনা। আবিয়ার নামে যে একজন বিদুষী স্ত্রী ছিলেন, তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। ইহাঁর সমস্ত জীবন-বৃত্তান্ত পাওয়া যায় নাই, যাইবারও কোন উপায় নাই। লেখক বহু কষ্টে যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার অনেক স্থল উপন্যাসসংশ্লিষ্ট। ইহা সত্ত্বেও তিনি আমাদিগের ধন্যবাদার্হ। এতৎপাঠে আবিয়ারের সময়ে ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষার কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, তাহার বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইনি খণার সম-সাময়িক ছিলেন। আমাদিগের দেশে যদ্যপি পূর্ব্বে জীবনী লেখার প্রথা থাকিত, তাহা হইলে আমরা আজ এই রমণীকুলতিলকের আদ্যোপান্ত জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া অধিকতর সুখী হইতাম। চানক্যের শ্লোকের মত ইহাঁর উপদেশগুলি সারগর্ভ। আমরা আশা করি এদেশের বালক বালিকাগণ এ সমস্ত উপদেশ যেন যত্নের সহিত পাঠ করেন। এরূপ পুস্তিকা যত প্রকাশিত হয়, ততই ভাল।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকাগুলি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। জীবন-সহায়। শ্রীমনোরঞ্জন গুহ কর্ত্তৃক লিখিত।
২। পাপীর জীবনে ভগবানের লীলা। দ্বিতীয় সংস্করণ। পূর্ব্ববঙ্গ নববিধান সমাজ হইতে প্রকাশিত।
৩। গীতি কবিতা। শ্রীভবানীচরণ ঘোষ প্রণীত।
৪। সখি-সমিতি শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।
৫। Hindu Religion by Deena Nath Ganguly
৬। পরাশর সংহিতা অনুবাদ সহিত। শ্রীকৈলাস চন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।
৭। শ্রীদারুব্রহ্ম অর্থাৎ জগন্নাথ দেবের বিবরণ। শ্রীকৈলাশচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক প্রণীত।
৮। আনন্দ-তুফান। শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রণীত।

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal July, 1886.
ভারতী ও বালক। শ্রাবণ ১২৯৩।
প্রচার। ঐ
সজ্জনতোষিণী। ঐ
নব্যভারত। ভাদ্র ১২৯৩।
আলোচনা। ঐ
সর্ব্ব-বিদ্যারত্নাকর বা তন্ত্র-শাস্ত্র। ত্রৈমাসিক পত্র। ১ম সংখ্যা।
Hindu Reformer, August 1886.
Fellow Worker, August 1886
Theosophist, Sept 1886.

সংবাদ।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে আমাদের বন্ধু শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। বহু দিন হইতে ইহাঁর আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযোগ। ইনি এখানকার এক জন আচার্য্য এবং প্রচারক ছিলেন। ভীষণ পৃষ্ঠব্রণ ইহাঁর মৃত্যুর কারণ। আজ প্রায় তিন মাস হইল তিনি এই রোগে যার পর নাই কষ্ট পাইতেছিলেন। কিন্তু গত ১৮ ভাদ্র রাত্রি ৯ টার সময় সর্ব্বসন্তাপহারক ঈশ্বর ইহাঁকে আপনার ক্রোড়ে লইয়া সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়াছেন। আমরা কায়মনে তাঁহার পরলোকগত আত্মার শুভ কামনা করি। তিনি এতাবৎকাল আমাদিগের মধ্যে থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন। এই তত্ত্ববোধিনীতে তাঁহার অনেক উপদেশ ও অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত আছে। অতঃপর সেই গুলি দুঃখের সহিত তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবে। তিনি বিলক্ষণ সুস্থ ও বলবান ছিলেন। আবহমান কাল মৎস্য মাংস স্পর্শ করেন নাই। এরূপ লোকের অকাল মৃত্যুতে আমরা বাস্তবিকই ব্যথিত হইলাম। ইনি উৎসাহী ও পরিশ্রমী ছিলেন। জীবনের প্রায় অর্দ্ধাংশ ধর্ম্মপ্রচারে ব্যয় করিয়াছেন। ইহাঁর জন্মস্থান বেহালা। ইনি তথায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ঔষধালয় স্থাপন প্রভৃতি প্রত্যেক সৎকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত বেহালা ব্রাহ্মসমাজ ইহাঁরই তত্ত্বাবধানে ছিল। তিনি এখন যথায়ই থাকুন ঈশ্বর তাঁহার সহায় হউন। আমাদের এই শেষ প্রার্থনা।

আয় ব্যয়।

বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৯১৪॥ ১৫
পূর্ব্বকার স্থিত ...	৩০০৮॥/ ৫
সমষ্টি	৩৯২৩ ৵০
ব্যয় ...	৯৪২।/ ১০
স্থিত	২৯৮০৸১০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৭৪৶ ৫
মাসিক দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরেঘাটা)	১।০
সাম্বৎসরিক দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী চন্দ্র	১৲
" " শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	২৲
" " শশীন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়	৫৲
" " মণিলাল মল্লিক	৪৲
" " রসিকলাল পাইন	৫৲
" " রাজকৃষ্ণ আঢ্য	১৲
" " প্যারিমোহন রায়	১০৲
" " শিবচন্দ্র নন্দী	৫৲
" " ফনীভূষণ মুখোপাধ্যায়	১০৲
শুভকর্ম্মের দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রিয় দেব	২৲
" " চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	৩৲
আনুষ্ঠানিক দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু কৃতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৲
" " সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৲
" " যশঃপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়	৪৲
" " জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪৲
" " সরোজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪৲
" " প্রমোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪৲
দানাধারে প্রাপ্তি	২৸৶৫
	৭৪৶৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২২০৸০
পুস্তকালয় ...	৬২॥৶০
যন্ত্রালয় ...	৪০৮॥৶১৫
গচ্ছিত ...	৫৬৸৶১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৮।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ...	৫০৲
দাতব্য ...	৯৲
গবর্ণমেণ্ট সেবিংশ ব্যাঙ্ক	৸৶৫
রামায়ণ	২৩৲
সমষ্টি	৯১৪॥ ১৫

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৪০৬॥৵১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৯৫৸৶
পুস্তকালয়	২ ৫
যন্ত্রালয়	৩৩৮৸৵১৫
গচ্ছিত	৩৬ ৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৬॥/ ৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	৫০৲
দাতব্য	৬৲
রামায়ণ	/১০
সমষ্টি	৯৪২।/১০

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৭ আশ্বিন মঙ্গলবার "বালী ধর্ম্ম সমাজের" চতুর্থ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। ধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণ উপাসনায় যোগদান করেন ইহা নিতান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীহীরালাল মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আগামী ২৮ এ আশ্বিন বুধবার কালনা ব্রাহ্মসমাজের উনবিংশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব উপলক্ষে প্রাতে ৭॥ ঘটিকা ও সায়ংকালে ৭ ঘটিকার পর উপাসনাদি কার্য্য আরম্ভ হইবে।

শ্রীবিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক সোমবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়স্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পর ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীশ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৪ আশ্বিন রবিবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭।

আচার্য্যের উপদেশ।

নানা সম্প্রদায়ের মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহার যে রূপ আদর্শ তাহার সেই রূপ উৎকর্ষ। কাহারো বা আদর্শ—শক্তি, কাহারো বা আদর্শ—জ্ঞান, কাহারো বা আদর্শ—ভক্তি। নানা মনুষ্যের নানা আদর্শ। এইরূপ ঐকাংশিক আদর্শের অনুশীলন কাল-ক্রমে যতই বিকাশ প্রাপ্ত হয়, ততই তাহা অন্য অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। শক্তির ঐকাংশিক অনুশীলন কাল-ক্রমে জ্ঞান এবং ভক্তির বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়; জ্ঞানের ঐকাংশিক অনুশীলন কাল-ক্রমে শক্তি এবং ভক্তির বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়; ভক্তির ঐকাংশিক অনুশীলন কাল-ক্রমে জ্ঞান এবং শক্তির বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের দেশের শাক্ত সম্প্রদায়, জ্ঞানী সম্প্রদায় এবং ভক্ত সম্প্রদায় ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল। কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ উক্ত প্রকার কোন আদর্শেরই প্রতিদ্বন্দ্বী নহে; যদি তাহাকে কাহারো প্রতিদ্বন্দ্বী বলিতে হয়, তবে তাহা বিরোধেরই প্রতিদ্বন্দ্বী; কেন না ব্রাহ্মধর্ম্মের কথানুসারে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, জ্ঞান ভক্তি এবং শক্তি এ তিনের মধ্যে বিরোধ দূরে থাকুক্—উহাদের মধ্যে পরম সদ্ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে; তিনের একটিকে ছাড়িলে আর-দুইটির প্রত্যেকেই অঙ্গহীন হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞান-চর্চার সপক্ষে এইরূপ বলেন যে, "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিবে এবং তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে; প্রেম-চর্চার সপক্ষে এইরূপ বলেন "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" পরমাত্মাকে প্রিয় রূপে উপাসনা করিবে; শক্তি-অনুশীলনের সপক্ষে এইরূপ বলেন যে,

> "সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং কু[শলান্ন] প্রমদিতব্যং"

সত্য হইতে বিচ্যুত হইবে না, ধর্ম্ম হ[ই]তে বিচ্যুত হইবে না, শুভ কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে না;—ইহা কত না শক্তিকে অপেক্ষা করে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এই যে, যে ভক্তি কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানের বিরোধী সে

ভক্তি ভক্তিই নহে,—যে জ্ঞান ভক্তির বিরোধী সে জ্ঞান জ্ঞানই নহে।

ঈশ্বর-জ্ঞানের প্রধান লক্ষণ—শ্রদ্ধা। ঈশ্বর আছেন—ইহাতে মনের ঐকান্তিক সম্মতি—ধ্রুব বিশ্বাস—ইহাই শ্রদ্ধা। এ বিশ্বাসের ভিতর ঐকান্তিক মস্তকের অবনতি ভিন্ন কোন প্রকার দ্বিরুক্তি স্থান পাইতে পারে না,—'না" এ কথাটি এ বিশ্বাসের ত্রিসীমায় স্থান পাইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাই বলেন "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে" যে ব্যক্তি বলেন যে, তিনি আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন। এইরূপ ঐকান্তিক সম্মতি-গর্ব্ভ বিশ্বাসই ঈশ্বরের সমস্ত উপাধি আমাদের জ্ঞান-নেত্রের সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। "না" যেখানে নাই, "নাই" সেখানে থাকিতে পারে না,—অতএব, জ্ঞান প্রেম শক্তি ইত্যাদি যত প্রকার সদাত্মক লক্ষন—সমস্তই ঈশ্বরেতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তদ্ভিন্ন, জড়তা, অশক্তি, প্রভৃতি অভাব-সূচক কোন লক্ষণই ঈশ্বরেতে বর্ত্তিতে পারে না। এইরূপ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং মাহাত্ম্যের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা।

ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিলে, তাঁহার সহিত আমাদের কি রূপ সম্বন্ধ তাহা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়; তখন আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি মহান্ প্রভু, আমরা তাঁহার [illegible]স্ত আশ্রিত; অতএব তাঁহার অভিপ্রেত [illegible] চলাই আমাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে [illegible]য়। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি ঈশ্বরের অভিপ্রেত পথ অন্বেষণ করেন এবং সেই পথে চলিতে অভ্যাস করেন—তাঁহার ধর্ম্ম-বুদ্ধিই তাঁহার পথ-প্রদর্শক। বিষয়ের উত্তেজনায় চালিত হইব না—কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তদনুসারে চলিব—এইরূপ বুদ্ধিই ধর্ম্মবুদ্ধি। ধর্ম্মবুদ্ধিকে সহায় করিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত পথে প্রাণপণে লাগিয়া থাকার নাম—নিষ্ঠা। শ্রদ্ধা জ্ঞান-গর্ব্ভ, নিষ্ঠা শক্তি-গর্ব্ভ। আমাদের আত্মাতে যে এক স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান-জ্যোতি আছে, তাহাই শ্রদ্ধার অবলম্বন; এবং আমাদের আত্মাতে যে এক্ নিয়ামিকা শক্তি আছে যদ্দারা আমাদের মন আমাদের আপনাদের বশে রক্ষিত হয়, সেই শক্তিই নিষ্ঠার অবলম্বন। এই শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠার দ্বার দিয়াই সাধক ভক্তি এবং প্রীতিতে উপনীত হ'ন।

সাধক ঈশ্বরের অভিপ্রেত ধর্ম্ম-পথে যতই অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই তাঁহার আত্মা হইতে মোহ-মেঘ সরিয়া যাইতে থাকে, এবং ততই তিনি ঈশ্বরের প্রসন্ন মূর্ত্তি অবলোকন করিতে থাকেন; তিনি আপনি যতই মঙ্গল-কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন—ঈশ্বরকে ততই মঙ্গলের আকর বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করেন। পৃথিবীতে স্বার্থপর প্রভুর অভাব নাই—ঈশ্বর সে রূপ প্রভু নহেন, তিনি আমাদের পরমহিতৈষী মঙ্গলময় প্রভু,—পুণ্যকর্ম্মের ফলে এইটি যখন সাধকের সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ জন্মে। পূর্ব্বে তিনি কর্ত্তব্য-বোধে যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, এখন তিনি আন্তরিক অনুরাগের সহিত সেই পথ অবলম্বন করেন। মোহ-মেঘের অপসারণে সাধক যখন ঈশ্বরের প্রসন্ন মূর্ত্তি অবলোকন করেন, তখনই তিনি বুঝিতে পারেন যে, ইনিই আমার একমাত্র ভজনীয়; তখনই তাঁহার মনোমধ্যে ঈশ্বরানুরাগ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে; ইহারই নাম ভক্তি।

সাধকের আন্তরিক ভক্তি ঈশ্বরের করুণা আকর্ষণ করে। ঈশ্বরের করুণামৃত সর্ব্বত্রই উন্মুক্ত রহিয়াছে; যাঁহার যে পরিমাণে পিপাসা, তিনি সেই পরিমাণে তাহা পান ক-

রেন। ভক্তের চিত্ত যে পর্য্যন্ত না ঈশ্বরের অপার করুণা-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়, সে পর্য্যন্ত তিনি ঈশ্বরারাধনায় ক্ষান্ত হ'ন না। সাধকের ভক্তি ক্রমে যতই উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকে—ঈশ্বরের প্রতি আত্মার আকর্ষণ যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে—ততই তিনি ঈশ্বরকে নিকটে পা'ন, ততই তিনি ঈশ্বরকে আপনার বলিয়া—আত্মার আত্মা বলিয়া—হৃদয়ঙ্গম করেন; এইরূপে তাঁহার ভক্তি ক্রমে ক্রমে প্রীতিরূপে পরিণত হইতে থাকে। শ্রদ্ধা নিষ্ঠা এবং ভক্তি তিনই প্রীতির অন্তর্ভূত—প্রীতি তিনের একটিকেও ছাড়িতে পারে না। যখনই সাধক ঈশ্বরকে অন্তরতম প্রিয়তম সুহৃৎ বলিয়া প্রীতি করেন, তখনই তিনি তাঁহাকে পরাৎপর পরমাত্মা বলিয়া ভক্তি করেন, এবং তাঁহার অনুগত সেবক হইয়া কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হ'ন। প্রীতি কোন ভাল সামগ্রীই নষ্ট করে না—সকলকেই যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করে; প্রীতি ভক্তির আর কিছুই অপহরণ করে না—কেবল ভয় অপহরণ করে, প্রীতি কর্ত্তব্য-সাধনের আর কিছুই অপহরণ করে না—কেবল কঠোরতা অপহরণ করে। ঈশ্বর-প্রীতিতে মনুষ্যের আত্মার যেমন উৎকর্ষ সাধিত হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাতে মনুষ্যের জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়; ঈশ্বরের পথে চলাতে মনুষ্যের শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়; ঈশ্বর-প্রীতিতে সমগ্র আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হয়। সাধক যখন ঈশ্বর-প্রীতিতে পরিশোধিত হইয়া মোহের তামসিক পরাক্রম আত্মা হইতে নিধূ'ত করিয়া ফেলেন, তখন ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার আত্মাতে আপনার জ্ঞানের কণা-মাত্র সঞ্চারিত করিয়া তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া দে'ন, এবং আপনার শক্তির কণা-মাত্র সঞ্চারিত করিয়া তাঁহার আত্মার বল দ্বিগুণিত করিয়া তোলেন। ঈশ্বর স্বয়ং যাঁহার চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ এবং আত্মার আত্মা হইয়া সমস্ত অভাব মোচন করেন, তাঁহার কিসের অভাব? ঈশ্বরকে যিনি হৃদয়ের সহিত প্রীতি করেন—তাঁহার কিসের অভাব? আত্মার উৎকর্ষ ঈশ্বর-প্রীতির অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু সাধক যতই কেন উৎকর্ষ লাভ করুন না—ঈশ্বর তাহা অপেক্ষা পরাৎপর পরম উৎকৃষ্ট; এজন্য আপনার আত্মার উৎকর্ষ সাধকের লক্ষ্যের উপযুক্ত নহে; ঈশ্বরই সাধকের লক্ষ্য, আত্মার উৎকর্ষ উপলক্ষ মাত্র। আত্মার উৎকর্ষ-সাধনের জন্য ঈশ্বর-প্রীতি নহে, কিন্তু ঈশ্বর-প্রীতির উপযুক্ত আধার হইবার জন্যই আত্মার উৎকর্ষ সাধন; এইরূপ হইলেই সাধক ঠিক্ পথে দণ্ডায়মান হ'ন। যে প্রীতির উদ্দেশ্য আপনার উৎকর্ষ সে প্রীতি প্রীতিই নহে; প্রিয় ব্যক্তিই যে প্রীতির সর্ব্বস্ব সেই নিষ্কাম প্রীতিই প্রকৃত প্রীতি। আত্মার উৎকর্ষ ঈশ্বর-প্রীতির অবশ্যম্ভাবী ফল, এবং ঈশ্বর-প্রীতির উপযুক্ত আধার—ইহা সত্য; কিন্তু আমাদের আত্মার উৎকর্ষই যদি আমাদের মুখ্য লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে আমরা এ কূল ও কূল দু কূল হারাই, তাহা হইলে আমরা আত্মার উৎকর্ষেও বঞ্চিত হই, এবং ঈশ্বরের সহবাসেও বঞ্চিত হই। নিষ্কাম ঈশ্বর-প্রীতিই মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ।

হে পরমাত্মন্! তোমার প্রেমের পিপাসু হইয়া আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি। তোমার প্রেমামৃতই আমাদের আত্মার জীবন। পাপতাপে জর্জরিত হইয়া আমরা তোমার দ্বারে উপনীত হইয়াছি, তুমি আমাদের প্রতি করুণাবারি বর্ষণ কর। তাপিত হৃদয়ে তোমার এক বিন্দু করুণা-বারি নিপতিত হইলে আনন্দের সাগর উথলিয়া উঠে ও সমস্ত দুঃখ শোক দূরে চলিয়া যায়।

মোহ মলিনতা অপসারিত করিয়া—নির্জীব হৃদয়ের জীবন-স্বরূপ হইয়া—তুমি আমাদের আত্মাতে আবির্ভূত হও, তাহা হইলেই আমরা চির জীবনের মত কৃতার্থ হইব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

দর্শন-সংহিতা।

অনুবাদকের মন্তব্য।

শাঙ্কর দর্শনের অদ্বৈত-বাদ এবং বর্ত্তমান দর্শনের দ্বৈত-বাদ, এ দুয়ের মধ্যে কিরূপ ঐক্যানৈক্য তাহা পূর্ব্বাহ্নে জানিয়া রাখা ভাল। আশ্চর্য্য এই যে, শাঙ্কর দর্শনের সহিত বর্ত্তমান দর্শনের যেখানে ঐক্য সেখানে খুবই ঐক্য, তেমনি আবার, যেখানে অনৈক্য সেখানে খুবই অনৈক্য।

(১) উভয়ের ঐক্য।

শাঙ্কর দর্শনেও যেমন—বর্ত্তমান দর্শনেও তেমনি—বিষয়-শব্দ অতীব ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। জড় বস্তুই যে কেবল বিষয়-শব্দের বাচ্য, তাহা নহে; স্বপ্নের বস্তু সকলও বিষয়-শ্রেণী-ভুক্ত। এমন কি—বর্ত্তমান খণ্ডের চতুর্থ সিদ্ধান্তে আছে

"All blanks, all nonentities, require to be supplemented by a "me" before they can be cogitable, just as much as all things require to be thus supplemented.

ইহার অর্থ এই যে, জ্ঞানে প্রকাশ পাইতে হইলে—বস্তু-সকলও যেমন—অভাব-সকলও তেমনি—একটি না একটি "আমি"র আশ্রয়াধীন না হইলেই নয়। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অভাব-সকলও (যেমন আলোকের অভাব অন্ধকার, শব্দের অভাব নিস্তব্ধতা, ঔষ্ণ্যের অভাব শৈত্য, জড়-বস্তুর অভাব শূন্য আকাশ, ক্রিয়ার অভাব শূন্য কাল, এই সকল অবস্তুরাও) জ্ঞানের বিষয়-শ্রেণী-ভুক্ত। পঞ্চদশীর গ্রন্থকার সুষুপ্তির অন্ধকারকেও বিষয়-শ্রেণীতে নিক্ষেপ করিয়াছেন, যথা,

"সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ত তমো-বোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ।
সা চাববুদ্ধ-বিষয়া হ্যববুদ্ধং তত্তদা তমঃ॥"

সুষুপ্তি কালের অন্ধকার-বোধ সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্মৃতি-পথে উপনীত হয়; পূর্ব্বজ্ঞাত বিষয়-সকলেরই স্মৃতি সম্ভবে; অতএব, সুষুপ্তি-কালের অন্ধকার সুষুপ্তি-কালে জ্ঞাত ছিল।

এইরূপ, উভয় দর্শনের মতেই দাঁড়াইতেছে যে, জড়-বস্তু, স্বপ্নের বস্তু, ভাবনার বস্তু, আকাশ, কাল, ইত্যাদি যত প্রকার অনাত্ম-বিষয় আছে—তা'সে বস্তুই হউক্ আর অবস্তুই হউক্—সমস্তই বিষয়-শ্রেণী-ভুক্ত। কিন্তু অনাত্ম-বিষয় সকলই কি কেবল বিষয়, আত্মা কি বিষয় নহে? বর্ত্তমান গ্রন্থের জ্ঞান-তত্ত্বের প্রথম সিদ্ধান্তে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয়ের মধ্যে আত্মাই কেবল একমাত্র নিরন্তর-জ্ঞেয়। নিম্ন-লিখিত কথোপকথনে এই সিদ্ধান্তটির যাথার্থ্য সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে;—

অনাত্ম-বাদী॥ আমি উপন্যাস-পাঠে এমনি নিমগ্ন ছিলাম যে, আমি যে পাঠ করিতেছি—সে বোধ তখন আমার ছিল না।

আত্মবাদী॥ এখন অবশ্য তোমার স্মরণ হইতেছে যে, তুমিই পাঠ করিতেছিলে?

অনাত্ম-বাদী॥ সে কি কথা,—এখন যদি তাহা আমার স্মরণ না হইবে, তবে কিরূপে আমি তোমার নিকটে তাহা জ্ঞাপন করিতে পারিব?

আত্ম-বাদী॥ ভুক্ত বস্তুরই রোমন্থন হয়, জ্ঞাত বস্তুরই স্মরণ হয়,—এই তো জানি! তুমি বলিতেছ যে, পাঠ-কালে তোমার এ জ্ঞান ছিল না যে, তুমি পাঠ করিতেছ, অথচ এখন তোমার স্মরণ হইতেছে যে, তুমিই পাঠ করিতেছিলে! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহা কোন-কালেই তোমার জানা

ছিল না, অকস্মাৎ এখন তাহা তোমার স্মরণে উদ্বোধিত হইয়া উঠিল! যে ব্যক্তির সহিত তোমার কোন-কালেই সাক্ষাৎকার নাই, সে ব্যক্তিকেও তুমি তবে স্মরণ করিতে পার! এ-টি তোমার কাছে আমি আজ নূতন শুনিতেছি! এ যদি বলিতে যে, উপন্যাসের প্রতি তোমার পোনেরো আনা মনোযোগ ছিল এবং তোমার আপনার প্রতি শুদ্ধ কেবল এক আনা মাত্র মনোযোগ ছিল, তাহা হইলে কোন হানি ছিল না; কিন্তু তুমি বলিতেছ যে, পাঠ-কালে তুমি মূলেই জান না যে, তুমি পাঠ করিতেছ, আর, সেই না-জানা বিষয়টি এখন তোমার স্মরণে আবির্ভূত হইতেছে! অগ্রে সাক্ষাৎ জ্ঞান পরে স্মরণ—এই তো জানি সম্ভবে; কিন্তু সাক্ষাৎ জ্ঞানের নাম-গন্ধও নাই—অথচ স্মরণ! এটা তো কিছুতেই আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির গলাধঃকরণ হইতেছে না।

অনাত্মবাদী॥ বলিয়াছ ঠিক্। উপন্যাস-পাঠের সময় নিশ্চয়ই আমি জানিতেছি যে, আমিই পাঠ করিতেছি; কারণ, অগ্রে যদি তাহা আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না জানিব, তবে পরে তাহা কিরূপে আমার স্মরণে উপস্থিত হইবে? পাঠ-কালে, উপন্যাসের প্রতি আমার যেরূপ পোনেরো আনা মনোযোগ ছিল, তাহার তুলনায় আমার আপনার প্রতি অতীব যৎসামান্য মনোযোগ ছিল—এই-মাত্র,—আপনার প্রতি মূলেই যে আমার মনোযোগ ছিল না—ইহা কোন কাজের কথা নহে। এখন বুঝিলাম যে, আত্মজ্ঞান শুধু-যে কেবল আমাদের স্মরণেরই সহচর, তাহা নহে, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও সঙ্গের সঙ্গী; সুতরাং প্রত্যক্ষ-জ্ঞান যেমন সাক্ষাৎ-জ্ঞান, আত্মজ্ঞানও সেইরূপ সাক্ষাৎজ্ঞান।

এইরূপে বর্ত্তমান দর্শনে প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, আমরা যাহা-কিছু জানি, তাহারই সঙ্গে জানি যে, আমিই জানিতেছি। জ্ঞেয় বিষয় অনেক আছে;—ঘটি একটি জ্ঞেয় বিষয়, বাটি একটি জ্ঞেয় বিষয়, ইত্যাদি; কিন্তু তাহাদের কেহই নিরন্তর-জ্ঞেয় নহে—জ্ঞান-মাত্রেরই অবিচ্ছেদ্য সহচর নহে; যাব ীয় জ্ঞেয় বিষয়ের মধ্যে আত্মাই কেবল একমাত্র নিরন্তর-জ্ঞেয়। পঞ্চদশীর গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের একস্থানে বলিয়াছেন।

"অবিদিত্বা স্বমাত্মানং বাহ্যং বেদ নতু ক্বচিৎ"

আপনাকে না জানিয়া কেহই অন্য কোন বিষয়কে জানিতে পারে না।

তবেই হইল যে, জ্ঞাতা যাহা কিছু জানে তাহারই সঙ্গে জানে যে, "আমিহ জানিতেছি;" আত্মা, জ্ঞান-মাত্রেরই, নিরন্তরজ্ঞেয়। এইটিই অবিকল বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম সিদ্ধান্ত। নিম্ন-লিখিত কতিপয় পংক্তি বেদান্ত দর্শনের মূল গ্রন্থের শাঙ্কর ভাষ্য হইতে উদ্ধৃত;—

"যুষ্মৎপ্রত্যয়াপেতস্য চ প্রত্যগাত্মনো বিষয়ত্বং ব্রবীষি?"

"ন তাবদয়ং একান্তেনা হবিষয়ঃ। অস্মৎ প্রত্যয় বিষয়ত্বাৎ।"

অর্থ।

প্রশ্ন॥ যাহা "আমি" ভিন্ন আর কোন কিছু ব-লিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, সেই নিকটতম আত্মাকে তুমি বিষয় বলিতেছ?

উত্তর॥ আত্মা যে, একান্তই বিষয় নহে, তাহা নহে; যেহেতু আত্মা অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয়। অস্মৎ-প্রত্যয়ের অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান দর্শন এবং শাঙ্কর দর্শন উভয়েরই মতে অ.ত্মা জ্ঞেয় বিষয়। এখন জ্ঞানের বিষয় কত প্রকার তাহা দেখা যা'ক্।

জ্ঞানের বিষয় দুই ভাগে বি ক্ত,—আত্মা এবং অনাত্মা। অনাত্ম-বিষয় দুই ভাগে বিভক্ত,—বাস্তবিক (যেমন দৃশ্য স্পৃশ্য ইত্যাদি) এবং অবাস্তবিক (যেমন কাল, স্বপ্ন, অন্ধকার ইত্যাদি)। বাস্তবিক বিষয়

দুই ভাগে বিভক্ত,—প্রত্যক্ষ (যেমন উপস্থিত দৃশ্য-স্পৃশ্য বিষয়) এবং পরোক্ষ (যেমন অনুপস্থিত স্মৃত বিষয়)। অবাস্তবিক বিষয় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; মনোময় (যেমন স্বপ্নের বস্তু) এবং অভাব রূপী (যেমন শূন্য কাল, অন্ধকার, নিস্তব্ধতা, ইত্যাদি)। এই শ্রেণী-বিভাগটি নিম্নে লতাবদ্ধ করিয়া প্রদর্শিত হইল ;—

- বিষয়
  - আত্মা
  - অনাত্মা
    - বাস্তবিক
      - প্রত্যক্ষ (দৃশ্যাদি)
      - পরোক্ষ (স্মৃতাদি)
    - অবাস্তবিক
      - মনোময় (স্বপ্নাদি)
      - অভাবরূপী (অন্ধকারাদি)

এই গেল জ্ঞানের বিষয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আলোকও জ্ঞানের বিষয়—অন্ধকারও জ্ঞানের বিষয়, জড়-বস্তুও জ্ঞানের বিষয়—শূন্য আকাশও জ্ঞানের বিষয়, এ যদি হইল,—জ্ঞানের অবিষয় তবে কি? বর্ত্তমান দর্শনের মতে যাহা স্ববিরোধী তাহাই জ্ঞানের অবিষয়; এক-পৃষ্ঠক পত্র অর্থাৎ যে পত্রের কেবল একটি মাত্র পৃষ্ঠা—তদ্ব্যতীত দ্বিতীয় পৃষ্ঠা নাই—ইহা জ্ঞানের অবিষয়; নির্গুণ বস্তু, অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব আছে কিন্তু না তাহার আপনার জ্ঞানে—না অন্য কাহারো জ্ঞানে—কোন জ্ঞানেই সে অস্তিত্বের উপলব্ধি নাই—ইহা জ্ঞানের অবিষয়; চিন্তাতীত বিষয়ের চিন্তা জ্ঞানের অবিষয়, ইত্যাদি। এই স্ববিরোধী অবিষয় যে কিরূপ তাহা প্রথম খণ্ডের চতুর্থ-সিদ্ধান্তের শেষ ভাগে সুস্পষ্টরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে, যথা ;—

"Does this contradictory nondescript exist?

* * * * * * *

This system is as far as any system can be from maintaining that matter per se is a nonentity—a blank. All blanks, all nonentities, require to be supplemented by a "me" before they can be cogitable, just as much as all things or entities require to be thus supplemented. But matter per se is, by its very terms, that which is unsupplemented by any "me;" therefore it, certainly, is not to be conceived as a nonentity. If idealism be a system which holds that matter per se is nothing, we forswear and denounce idealism. True idealism, however, never maintained any such absurd thesis. But does not true idealism reduce every thing in the universe to a mere phenomenon of consciousness? suppose it does,—does it not also reduce every nothing in the universe to a mere phenomenon of consciousness? The materialist supposes that, according to idealism, when a loaf of bread ceases to be a phenomenon of consciousness and is locked away in a dark closet, it must turn into nothing. He might as well fancy that, according to idealism, it must turn into cheese. Idealism does not hold that when a thing ceases altogether to be a phenomenon of consciousness, it becomes another phenomenon of consciousness, as this supposition would imply. No—in the absence of all consciousness, the loaf, or whatever it may be, lapses, not into nothing, but into the contradictory. It becomes the absolutely incogitable—a surd—from which condition it can be redeemed only when some consciousness of it is either known or conceived."

ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, জড় বস্তু যে সময়ে কোন জ্ঞানেই প্রকাশ পাইতেছে না, সে সময়ে তাহা কিরূপ? জ্ঞান-বহির্ভূত জড় বস্তু স্বতঃ কিরূপ? হয়—তাহা "কিছু," অর্থাৎ ভাব-পদার্থ; নয়—তাহা "কিছু না," অর্থাৎ অন্ধকারাদির ন্যায় অভাব-পদার্থ; নয় তাহা "কিছু অথচ কিছু না", অর্থাৎ বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত যেমন যখনই আছে তখনই নাই—আছে অথচ নাই—উহা তেমনি একটা বিরোধ-পদার্থ;—জ্ঞান-বহির্ভূত জড়বস্তু, স্বতঃ, এই তিন শ্রেণীর কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত? তাহা "কিছু"র দল-ভুক্ত, না "কিছু-না"র দল-ভুক্ত, না "কিছু অথচ কিছুনা"র দলভুক্ত? যদি বল যে, তাহা "কিছু," তবে দাঁড়ায় এই যে, তাহা ঘটপটাদির ন্যায় জ্ঞান-গোচর একটা কিছু—কিন্তু তাহা হইলে তাহা আর জ্ঞান-বহির্ভূত হইল

না; যদি বল যে, তাহা "কিছু না," তবে দাঁড়ায় এই যে শূন্য আকাশ—শূন্য কাল—অন্ধকার—এই সকল অবস্তুর ন্যায় তাহা জ্ঞান-গোচর অভাব পদার্থ; কিন্তু জ্ঞান-বহির্ভূত জড়বস্তুর স্বরূপ-লক্ষণই এখানে জিজ্ঞাস্য, জ্ঞান-গোচর কোন কিছুই এখানে জিজ্ঞাস্য নহে; তবেই দাঁড়াইতেছে যে, "কিছু অথচ কিছু না" ইহাই জ্ঞান-বহির্ভূত জড়বস্তুর স্বরূপ। জ্ঞান-বহির্ভূত জড়বস্তু ভাব পদার্থও নয়, অভাব-পদার্থও নয়,—তাহা বিরোধ-পদার্থ। বেদান্তসারে অবিদ্যার যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা অবিকল ঐরূপ, যথা;—

"সদসদ্‌ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞান-বিরোধি ভাব-রূপং যৎকিঞ্চিৎ।"

অর্থ।

তাহা আছে কি নাই তাহা বলিতে পারা যায় না অর্থাৎ কিছু-অথচ-কিছুনা এইরূপ বিরোধ-পদার্থ; ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ প্রকাশ অপ্রকাশ এবং অস্থিরতা এই তিন বিরোধী লক্ষণাক্রান্ত; জ্ঞান-বিরোধী ভাবরূপী একটা কিছু।

অবিদ্যাকে ত্রিগুণাত্মক বলিবার তাৎপর্য্য কি দেখা যা'ক্। জ্ঞান-বহির্ভূত জড়বস্তু যে অংশে জ্ঞানের নিকট হইতে লুকাইয়া থাকে সে অংশে তাহা তমোগুণ;—"কিছু অথচ কিছু না" এই যে, অবিদ্যা, ইহার কিছু-না-অংশটি তমোগুণ; অবিদ্যা যে অংশে জ্ঞানের নিকট প্রকাশ-যোগ্য, সে অংশে তাহা সত্ত্বগুণ; কেননা, জ্ঞানের নিকটে প্রকাশ-যোগ্যতাই জড়বস্তুর সত্ত্ব, কি[illegible] সত্ত্বা—অস্তিত্ব;—সদসদাত্মক অবিদ্যার [illegible]দংশটিই সত্ত্ব গুণ; এবং যে অংশে তাহা জ্ঞানের নিকট অগ্রসর হইয়াও জ্ঞানকে ধরা দেয় না—জ্ঞানের চক্ষে কেবল ধাঁদা লাগাইয়া দেয়—সেই অংশে তাহা রজোগুণ; সদসদাত্মক অবিদ্যার স্বরূপ-গত বিরোধাংশটিই রজোগুণ। জড়বস্তু, স্বরূপতঃ—অর্থাৎ যে-অংশে তাহা জ্ঞানের অগোচর, সেই অংশে, অবিদ্যা-শব্দের বাচ্য; যে-অংশে তাহা জ্ঞানের গোচর সে অংশে তাহা অবিদ্যা নহে। জ্ঞান স্পর্শ-মণিতুল্য; জ্ঞানের সংস্পর্শ-মাত্রে অবিদ্যা বিদ্যায় পরিণত হয়—স্ববিরোধী অবিরোধীতে পরিণত হয়—অনির্ব্বচনীয় সুনির্ব্বচনীয়ে পরিণত হয়। জ্ঞানে প্রকাশ পাওয়াই অবিদ্যার মৃত্যু, এবং অবিদ্যার মৃত্যুই বিদ্যার জন্ম। অবিদ্যার গর্ব্ভেই অবিদ্যার মৃত্যু প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—বিদ্যার বীজ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—সত্ত্বগুণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সত্ত্ব-গুণের প্রাদুর্ভাব (অর্থাৎ জ্ঞানে প্রকাশ পাওয়া) যদিচ অবিদ্যার মৃত্যু-স্বরূপ, কিন্তু সেই মৃত্যুই অবিদ্যার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সত্ত্বগুণ-প্রধান অবিদ্যা সতীর সহিত উপমেয়; রজোগুণ দক্ষের সহিত উপমেয়; জ্ঞান শঙ্করের সহিত উপমেয়। দক্ষ যেমন শঙ্করের বিরোধী, রজোগুণ সেইরূপ জ্ঞানের বিরোধী; সতী যেমন পতি-প্রাণা, সত্ত্বগুণ-প্রধান অবিদ্যা সেইরূপ জ্ঞান-প্রাণা; সতী যেমন প্রাণ-ত্যাগ করিয়া উমা হইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাবে অবিদ্যা সেইরূপ প্রাণ-ত্যাগ করিয়া বিদ্যা হইয়া জন্ম-গ্রহণ করে। অবিদ্যা কেবল জীব সন্নিধানেই অবিদ্যা, ঈশ্বর-সন্নিধানে তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্ব-গুণ-মাত্রে পর্য্যবসিত; কেন না পূর্ণ জ্ঞানে সমস্তই প্রকাশমান—কিছুই অপ্রকাশ থাকিতে পারে না।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানের—বিষয় সম্বন্ধেও যেমন—অবিষয় সম্বন্ধেও তেমনি—উভয় দর্শনেরই মতের ঐক্য রহিয়াছে। নিম্নে জ্ঞানের বিষয় এবং অবিষয় সমস্তই লতাবদ্ধ করিয়া প্রদর্শিত হইল।
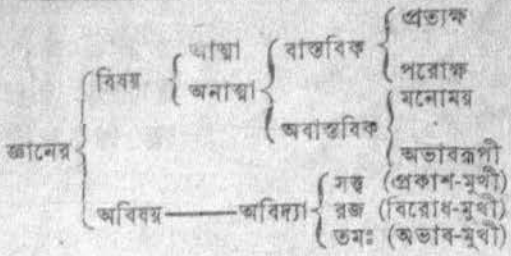
এই তো গেল জ্ঞানের বিষয় এবং অবিষয়। এখন আত্মা এবং অনাত্মার পরস্পরের সম্বন্ধ বিষয়ে দুই দর্শনের কিরূপ ঐক্য তাহা দেখা যা'ক।

নিম্ন-লিখিত দুইটি শ্লোক পঞ্চদশী হইতে উদ্ধৃত।

"অহম্বৃত্তি রিদম্বৃত্তিরিত্যন্তঃকরণং দ্বিধা।
বিজ্ঞানং স্যাদহম্বৃত্তি রিদংবৃত্তি র্মনো ভবেৎ।
অহম্প্রত্যয় বীজত্ব মিদম্বৃত্তেরতি স্ফুটং।
অবিদিত্বা স্বমাত্মানং বাহ্যম্বেদ নতু কচিৎ॥"

অর্থ।

অন্তঃকরণের বৃত্তি দুই প্রকার,—অহংবৃত্তি (অর্থাৎ আত্মবিষয়ক বৃত্তি) এবং ইদম্বৃত্তি (অর্থাৎ অনাত্ম-বিষয়ক বৃত্তি)। অহম্বৃত্তিই বিজ্ঞান এবং ইদম্বৃত্তিই মন। ইহা অতীব স্পষ্ট যে, অহম্প্রত্যয় (আত্মজ্ঞান) ইদম্বৃত্তির (অনাত্মবিষয়ক জ্ঞানের) বীজ স্বরূপ। কারণ, আপনাকে না জানিয়া কেহই অন্য কোন বিষয়কে জানিতে পারে না।

পঞ্চদশীর এই কয়েকটি কথা বর্ত্তমান গ্রন্থের বর্ত্তমান খণ্ডের আপাদ মস্তক অধিকার করিয়া রহিয়াছে; অতএব উহার অর্থের প্রতি সবিশেষ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। জ্ঞানমাত্রেরই দুইটি বৃত্তি; তাহার মধ্যে একটি আপনাকে লইয়া ব্যাপৃত হয়—এইটি অহম্বৃত্তি, আর-একটি অনাত্ম-বিষয় লইয়া ব্যাপৃত হয়—এইটি ইদম্বৃত্তি। কি অভিপ্রায়ে অহম্বৃত্তিকে বিজ্ঞান এবং ইদম্বৃত্তিকে মন বলা হইতেছে, এখানে তাহা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। বিজ্ঞান যে কি—তাহা তাহার কার্য্যেই সপ্রকাশ;—সাধারণ-তত্ত্ব অবধারণ পূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ পরীক্ষিত বিবরণ দ্বারা তাহার পুষ্টি-সাধন করাই বিজ্ঞানের একমাত্র কার্য্য। যে কোন বিজ্ঞান হউক্ না কেন (যেমন জ্যোতিষ বিজ্ঞান) তাহার সাধারণ তত্ত্বগুলি ছাঁটিয়া ফেলিলে, বিশেষ বিশেষ বিবরণ যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা বিজ্ঞাননামের অযোগ্য। অতএব,জ্ঞানের যে অংশ সাধারণ তত্ত্ব-গর্ব্ভ তাহাই বিজ্ঞান-শব্দের বাচ্য; আর, যে অংশ বিশেষ বিশেষ বিষয়-গর্ব্ভ তাহাই মনঃশব্দের বাচ্য। অহম্বৃত্তি যদি সাধারণ-তত্ত্ব-গর্ব্ভ হয়, তবেই তাহা বিজ্ঞান শব্দের বাচ্য, নচেৎ নয়। কাণ্ট, যিনি ইউরোপের একজন প্রধান-তম তত্ত্ববিৎ, তাঁহার মতে অহম্বৃত্তি ("The I Think" অর্থাৎ আমি চিন্তা করিতেছি বা আমি জানিতেছি,—এই ব্যাপারটি) এমনি একটি ব্যাপকতম সাধারণ-তত্ত্ব যে, তাহা বিজ্ঞানের সমস্ত মূলতত্ত্বেরই ভিত্তি-মূল। অতএব পঞ্চদশীর এই যে একটি কথা যে, অহম্বৃত্তিই বিজ্ঞান, ইহাকে "সেকেলে" বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া ইহার তাৎপর্য্যের প্রতি যত্নপূর্ব্বক প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। একটা কোন অনাত্ম-বিষয় ধর—যেমন ঘট; আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে ঘট থাকিলেও থাকিতে পারে—না-থাকিলেও না-থাকিতে পারে—ঘটের পরিবর্ত্তে পট থাকিতে পারে—পটের পরিবর্ত্তে আর একটা কিছু থাকিতে পারে; অতএব ঘট-পটাদি বিষয়-সকল জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ সময়ের বিশেষ বিশেষ বিষয়—সকল সময়ের সাধারণ তত্ত্ব নহে। কিন্তু যখন আমি ঘট জানি-[illegible]তেছি—তখনও আমি জানিতেছি যে,আমিই [illegible]তেছি,—যখন আমি পট জানিতেছি [illegible]নও আমি জানিতেছি যে, আমিই জানিতেছি; সুতরাং 'আমি জানিতেছি' (কাণ্টের ("The I think") এই যে একটি ব্যাপার, ইহা জ্ঞানের কোন বিশেষ সময়ের বিশেষ বৃত্তান্ত নহে—ইহা জ্ঞানের সকল সময়েরই সাধারণ তত্ত্ব। তবেই হইতেছে যে

অহম্বৃত্তি সাধারণ-তত্ত্বগর্ভ। পূর্ব্বে বলিয়াছি (এবং বিজ্ঞান-শাস্ত্র মাত্রই আমাদের এ কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছে) যে, জ্ঞানের যে অংশ সাধারণ তত্ত্ব-গর্ভ তাহাই বিজ্ঞান-শব্দের বাচ্য; অতএব পঞ্চদশীর এ কথাটি অকাট্য যে, অহম্বৃত্তি বিজ্ঞান। অহম্বৃত্তিই যে মূল বিজ্ঞান, ইহা বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের অষ্টম সিদ্ধান্তে রীতিমত প্রমাণ করা হইয়াছে। পঞ্চদশী তাহার পরে বলিতেছেন যে, "অহম্প্রত্যয়-বীজত্বমিদংবৃত্তেরতিস্ফুটং" ইহার অর্থ এই যে, আত্মজ্ঞানই অনাত্মজ্ঞানের বীজ কি না ভিত্তি-মূল; এই বচনটির সপক্ষে বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম সিদ্ধান্তের গোড়াতেই আছে যে, জ্ঞাতা যাহা কিছু জানে, তাহার সেই জ্ঞানের ভিত্তিমূল স্বরূপে আপনাকে কিছু-না-কিছু জানা তাহার নিতান্ত আবশ্যক; সংক্ষেপে, অনাত্ম-জ্ঞান মাত্রই আত্ম-জ্ঞানের আশ্রয়-সাপেক্ষ। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, আত্মা এবং অনাত্মার পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়েও দুই দর্শনের কোন মত-ভেদ নাই। এখানে সে সম্বন্ধটি আর-একটু স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। সাধারণ-তত্ত্ব (যেমন "যে জড়-পিণ্ডের ঘনত্ব এবং বিস্তৃতি যত অধিক তাহার আকর্ষণ-শক্তি তত প্রবল" এই একটি সাধারণ তত্ত্ব) নিয়ম ব্যক্ত করে, এবং তাহার অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ বিবরণ (যেমন গ্রহাদির গতিবিধি) সেই নিয়ম মানিয়া চলে; সাধারণ তত্ত্ব নিয়ামক, এবং তাহার অধীনস্থ বিশেষ বিশেষ বিবরণ নিয়ম্য;—দুয়ের মধ্যে এইরূপ নিয়ম্য-নিয়ামক সম্বন্ধ। সাধারণ-তত্ত্ব-গর্ভ অহম্বৃত্তি বা মূল বিজ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়-গর্ভ ইদম্বৃত্তি বা মন, এ দুয়ের মধ্যেও, কাজেই, সেইরূপ নিয়ম্য-নিয়ামক সম্বন্ধ; তাহার মধ্যে অহম্বৃত্তি (ধীবৃত্তি বা বিজ্ঞান) নিয়ামক এবং ইদম্বৃত্তি (মনোবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়-বৃত্তি) নিয়ম্য। এ পর্য্যন্ত দুই দর্শনের মধ্যে কেবল ঐক্যই উপলব্ধি করা গেল—অনৈক্যের বিন্দুবিসর্গও দৃষ্টি-গোচর হইল না। এখন কথা এই যে, মানিলাম—অহম্বৃত্তি ইদম্বৃত্তির নিয়ামক সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি শেষোক্ত বৃত্তি অপেক্ষা উচ্চ পদবীস্থ; কিন্তু তাহা বলিয়া কখনো কি এরূপ হইতে পারে যে, অহম্বৃত্তি আপনার সেই উচ্চ পদবীতে ঐকান্তিক ভর করিয়া দাঁড়াইয়া ইদম্বৃত্তির সহিত একেবারেই সম্পর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাকী অবস্থিতি করিতেছে? যদি বল যে, হাঁ—তাহা হইতে পারে, তবে তুমি অদ্বৈতবাদী; যদি বল যে, না—তাহা হইতে পারে না, তবে তুমি দ্বৈতবাদী। এই যে এক হাঁ না, এই সূক্ষ্ম-সূত্রটিতে দুই দর্শনের সমস্ত মত-ভেদ লম্বমান রহিয়াছে।

(২) উভয়ের অনৈক্য।

এখন আমরা বিষম এক সংকট স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এই স্থানটি স্ব-বিরোধে পরিপূর্ণ। পঞ্চদশীর গ্রন্থকার এইমাত্র বলিলেন "অবিদিত্বা স্বমাত্মানং বাহ্যং বেদ নতু ক্বচিৎ" আপনাকে না জানিয়া কেহই অন্য কোন বিষয়কে জানিতে পারে না; ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আত্মা আপনাকে জানে—আত্মা আপনিই আপনার জ্ঞেয় বিষয়। সুতরাং আত্মা জ্ঞেয়-বিষয়ের শ্রেণীভুক্ত। আর, ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং আত্মাকে জ্ঞেয় বিষয়ের দল-ভুক্ত করিয়াছেন—"অস্মৎ প্রত্যয় বিষয়ত্বাৎ" যে হেতু আত্মা আপনি আপনার জ্ঞানের বিষয়; কিন্তু অনতিপরেই পঞ্চদশী বলিতেছেন।

"স্বয়মেবানুভূতিত্বাৎ বিদ্যতে নানুভাব্যতা।
জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তরাভাবাৎ অজ্ঞেয়ো ন ত্বসত্তয়া॥

আত্মা নিজেই জ্ঞান স্বরূপ, এই জন্য তিনি জ্ঞেয়

নহেন ; তাঁহার অন্য জ্ঞাতা নাই বলিয়াই তিনি জ্ঞেয় নহেন—তাঁহার অস্তিত্ব নাই বলিয়া নহে।

অর্থাৎ অনাত্ম-বিষয়-সকল হইতে ভিন্ন যে, জ্ঞান, তাহাই অনাত্ম বিষয়-সকলকে জানে ; কিন্তু জ্ঞান-হইতে ভিন্ন এমন কি-বস্তু আছে যাহা জ্ঞানকে জানিবে ? জ্ঞানের অন্য কোন জ্ঞাতা নাই বলিয়াই জ্ঞান অজ্ঞেয়—জ্ঞানের অস্তিত্ব নাই বলিয়া নহে। ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই যে, জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে অথচ সে অস্তিত্ব কাহারো উপলব্ধি-গম্য নহে, যেহেতু জ্ঞান অজ্ঞেয়। উপরের শ্লোকটিতে আত্মা অন্য কর্ত্তৃক (অর্থাৎ অনাত্মা কর্ত্তৃক) জ্ঞেয় না হওয়া অপরাধে একেবারেই অজ্ঞেয়ের অন্ধকূপে বলপূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত হইল। দ্বৈতবাদী এ ব্যাপারটি নির্ব্বিবাদে যাইতে দিতে পারে না—তাই নিম্ন-লিখিত বাদানুবাদ ;—

দ্বৈতবাদী॥ যাহা অন্য কর্ত্তৃক জ্ঞেয় নহে কিন্তু আপনা-কর্ত্তৃক জ্ঞেয়, তাহাকে কি জ্ঞেয় বলিতে পারা যায় না ?

অদ্বৈতবাদী॥ কেন পারা যাইবে না ? আপনা-কর্ত্তৃকই হউক, আর, অন্য-কর্ত্তৃকই হউক, জ্ঞেয় যে—সে জ্ঞেয়। এ তো অতি সহজ কথা স্পষ্ট পড়িয়া আছে।

দ্বৈতবাদী॥ তুমি বলিতেছ—যাহা আপনা কর্ত্তৃক জ্ঞেয় তাহাও জ্ঞেয়, যাহা অন্য-কর্ত্তৃক জ্ঞেয় তাহাও জ্ঞেয়,—অজ্ঞেয়, তবে, কি ?

অদ্বৈতবাদী॥ যাহা আপনা-কর্ত্তৃকও জ্ঞেয় নহে, অন্য-কর্ত্তৃকও জ্ঞেয় নহে, তাহাই অজ্ঞেয়।

দ্বৈতবাদী॥ তুমি বলিতেছ আত্মা অজ্ঞেয়। তবে কি আত্মা আপনা-কর্ত্তৃক বা অন্য কর্ত্তৃক কাহারো কর্ত্তৃক জ্ঞেয় নহে ?

অদ্বৈতবাদী॥ যখন বলিয়াছি "অজ্ঞেয়" তখন বুঝিতে হইবে যে, আপনা কর্ত্তৃকও জ্ঞেয় নহে—অন্য কর্ত্তৃকও জ্ঞেয় নহে।

দ্বৈতবাদী। কিন্তু তুমি আপনিই বলিয়াছ "অবিদিত্বা স্বমাত্মানং বাহ্যংবেদ নতু নতু ক্বচিৎ" আপনাকে না জানিয়া কেহই অন্য কোন বিষয়কে জানিতে পারে না। তোমার আপনার কথা অনুসারেই দাঁড়াইতেছে যে, আত্মা যেমন অন্যান্য বিষয়কে জানে, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেও জানে ; তবেই হইল যে, আত্মা আপনা-কর্ত্তৃক জ্ঞেয়। আর, এইমাত্র তুমি বলিলে, যাহা আপনা-কর্ত্তৃক জ্ঞেয় তাহাও জ্ঞেয় ; অতএব তোমারই কথায় দাঁড়াইতেছে যে, আত্মা জ্ঞেয়। এখন তুমি তাহার উল্টা বলিতেছ—এখন বলিতেছ আত্মা অজ্ঞেয়! ইহার কোন্‌টা ঠিক্ ?

অদ্বৈত-বাদী॥ ও দুই কথার মধ্যে—বিরোধ তো আমি কিছুই দেখিতেছি না। আমি কি বলিয়াছি ? আমি কেবল বলিয়াছি যে, আত্মা যখন যে-কোন অনাত্ম-বিষয়কে জানে, তখন, তাহারই সঙ্গে সে আপনাকে জানে। কিন্তু যখন সে কোন অনাত্ম বিষয়কেই না জানে, তখন কি হয় ? তখনও কি সে আপনাকে জানে ? নিরুপাধিক জ্ঞানের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইদম্‌স্ফূর্ত্তির অস্তগমন অনিবার্য্য, এবং ইদম্‌স্ফূর্ত্তির অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে অহম্‌স্ফূর্ত্তির অস্তগমন অনিবার্য্য। সমাধি-কালে ইদম্‌স্ফূর্ত্তির উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে অহম্‌স্ফূর্ত্তিও উন্মূলিত হয়, তখন কেবল মাত্র এক নিরুপাধিক জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে। জ্ঞানের অস্তিত্ব পূর্ব্বেও যেমন ছিল, তখনও তেমনি থাকে—মধ্য হইতে কেবল তাহার ইদম্‌স্ফূর্ত্তি এবং অহম্‌স্ফূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া যায়।

দ্বৈতবাদী॥ তুমি বলিতেছ যে, ইদম্‌স্ফূর্ত্তি উন্মূলিত হইলে তাহার সঙ্গে অহ-

স্মৃত্তিও উন্মূলিত হইয়া যায়, এ কথা আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত শিরোধার্য্য করিতেছি; কিন্তু তুমি যে বলিতেছ যে, অহস্মৃত্তি অন্তর্হিত হইলেও জ্ঞানের অস্তিত্ব থাকিতে পারে—এ কথায় আমি কোন ক্রমেই সায় দিতে পারি না; তাহা শুধু নয়, যে-কারণে আমি তোমার পূর্ব্বোক্ত কথা শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছি, সেই একই কারণে আমি তোমার শেষোক্ত কথা শিরোধার্য্য করিতে অসমর্থ হইতেছি।

অদ্বৈতবাদী॥ সে কারণ-টা কি তাহা ব্যক্ত করিয়া বলিলে ভাল হয়।

দ্বৈতবাদী॥ ব্যক্ত করিয়া বলিতে আমি যে, কুণ্ঠিত, তাহা মনে করিও না; তবে কি না—গুছাইয়া বলিতে একটু সময় লাগিবে, তাহাতে যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তবে সংকোচের অন্য কোন কারণ নাই—সমস্তই ব্যক্ত করিয়া বলিতেছি;—

কোন একটি বস্তু ধর—যেমন বৃক্ষ; বৃক্ষ মাত্রেরই এরূপ কতক-গুলি লক্ষণ থাকা চাই, যাহা শাল তাল তমাল প্রভৃতি সকল বৃক্ষেরই সাধারণ লক্ষণ; এবং সেই সাধারণ লক্ষণ-গুলির সমষ্টিকে আমরা সংক্ষেপে বৃক্ষত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। কিন্তু এরূপ একটা বৃক্ষ আমাকে দেখাও দেখি—যাহার শুদ্ধ কেবল ঐ সাধারণ লক্ষণটিই (বৃক্ষত্ব লক্ষণ-টিই) আছে, তদ্ভিন্ন বিশেষ লক্ষণ একটিও নাই? কখনই তাহা পারিবে না। যদি বট বৃক্ষ দেখাও, তবে, তাহার যেমন বৃক্ষত্ব আছে—তেমনি তাহার সঙ্গে তাহার বটত্বও আছে; যদি দেবদারু দেখাও, তবে, তাহার যেমন বৃক্ষত্ব আছে, তেমনি তাহার সঙ্গে তাহার দেবদারুত্বও আছে। এমন একটিও বৃক্ষ তুমি আমাকে দেখাইতে পারিবে না, যাহার শুধুই কেবল বৃক্ষত্ব আছে—তদ্ব্যতীত আর-কোন-কিছুত্বই নাই। বৃক্ষের এ যেমন দেখা-গেল—জ্ঞানেরও অবিকল এইরূপ। সকল বৃক্ষের সঙ্গেই যেমন বৃক্ষত্ব লক্ষণটি ক্রমাগতই লাগিয়া আছে, সেইরূপ, সকল জ্ঞানের সঙ্গেই "আমি জানিতেছি" এই জ্ঞান-টি নিরন্তর লাগিয়া আছে; আত্ম-জ্ঞান সকল জ্ঞানেরই সাধারণ ধর্ম্ম। কোন বৃক্ষই যেমন শুদ্ধ কেবল তাহার সাধারণ ধর্ম্মটির (বৃক্ষত্বের) উপর ভর করিয়া তাহার বিশেষ লক্ষণটির সহিত (যেমন শালত্বের বা তালত্বের বা আর-কোন-কিছুত্বের সহিত) একেবারেই সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ কোন জ্ঞানই শুদ্ধ কেবল তাহার সাধারণ ধর্ম্মটির (অহস্মৃত্তিটির) উপর ভর করিয়া তাহার বিশেষ লক্ষণটির সহিত (ঘট-জ্ঞান, আকাশ-জ্ঞান, অন্ধকার-জ্ঞান, মনো-রাজ্য-জ্ঞান, এই প্রকার কোন-না-কোন জ্ঞানের সহিত, এক কথায়—ইদস্মৃত্তির সহিত) একেবারেই সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে পারে না। বৃক্ষত্ব ভিন্ন যাহার আর কোন কিছুত্বই নাই—এরূপ বৃক্ষের অস্তিত্ব যেমন অসম্ভব, তেমনি অহস্মৃত্তি ভিন্ন যাহার আর কোন বৃত্তিই নাই এরূপ জ্ঞানের অস্তিত্ব অসম্ভব। কোন পত্রই যেমন এরূপ হইতে পারে না যে, শুদ্ধ কেবল তাহার একটি-মাত্র পৃষ্ঠা—তা'ছাড়া দ্বিতীয় পৃষ্ঠা নাই, সেইরূপ কোন বৃক্ষই এরূপ হইতে পারে না যে, তাহার কেবল বৃক্ষত্বই আছে—আর-কোন-কিছুত্বই নাই,—কোন জ্ঞানই এরূপ হইতে পারে না যে, শুদ্ধ কেবল তাহার অহস্মৃত্তিই আছে—ইদস্মৃত্তি মূলেই নাই। এ বিষয়ে তোমার আমার মধ্যে মত-ভেদ নাই। তবে তুমি কেমন করিয়া এমন একটি পত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছ যাহার দুই পৃষ্ঠার কোন পৃষ্ঠাই নাই—এমন একটি বৃক্ষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছ যাহার বৃক্ষত্ব পর্য্যন্ত

নাই—এমন একটি জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছ যাহার অহম্স্মৃত্তি পর্য্যন্ত নাই। তোমার কৃত এরূপ সিদ্ধান্তের আমি কোন অর্থই খুঁজিয়া পাইতেছি না। যে-জ্ঞান নিজেই আপনাকে জানে না—সুতরাং আপনার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে না—সে জ্ঞানের অস্তিত্ব অপর ব্যক্তি কিরূপে উপলব্ধি করিবে? কেহই যে জ্ঞানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে না, সে জ্ঞান আছে—ইহা কে বলিল? জ্ঞানই জ্ঞানের থাকিবার স্থান। জ্ঞান যদি আপনার জ্ঞানে বিদ্যমান না থাকিবে—তবে আর কোথায় থাকিবে? জ্ঞান আপনার জ্ঞানে নাই—শুধু কেবল তোমার মুখের কথাতেই আছে—এরূপ থাকিলেই বা কি, আর, না থাকিলেই বা কি! জ্ঞান নিজে আপনার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছে না, যাহার অস্তিত্ব—সে তাহা উপলব্ধি করিতেছে না, অথচ তুমি বলিতেছ যে, তাহার অস্তিত্ব আছে—যেন দিব্য তুমি তাহা উপলব্ধি করিতেছ! দেখিতেছ অন্ধকার—বলিতেছ আলোক! "অন্ধকারই আলোক" এ কথা তুমিই বলো, আমিই বলি, আর একজন অসামান্য মহাপুরুষই বলুন, অন্ধকার যে—সে অন্ধকারই!

অদ্বৈতবাদী॥ তুমি কি তবে বলিতে চাও যে, ইদম্স্মৃত্তি-শূন্য নিরুপাধিক জ্ঞানের অস্তিত্ব মূলেই সম্ভবে না? বেদে কি আছে শ্রবণ কর;—

"ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং। সবা এব মহানজ আত্মা।"

এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে, হে প্রিয় শিষ্য! কেবল একই অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ছিলেন। তিনি জন্মবিহীন মহান্ আত্মা।

যখন ইদং বলিয়া কিছুই ছিল না, তখন অবশ্য ইদম্স্মৃত্তিও ছিল না। তুমি আপনিই বলিয়াছ যে, ইদম্স্মৃত্তির অবিদ্যমানে অহম্স্মৃত্তিও থাকিতে পারে না; সুতরাং অহম্স্মৃত্তিও ছিল না। কিন্তু অহম্স্মৃত্তির অবিদ্যমানেও এক মাত্র অদ্বিতীয় জন্ম-বিহীন মহান্ আত্মা ছিলেন। প্রথমে, তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, পরমাত্মা জ্ঞানস্বরূপ এবং সৃষ্টির পূর্ব্বেও তিনি বর্ত্তমান ছিলেন, এ কথা তুমি মানো কি না?

দ্বৈতবাদী॥ ঈশ্বর জ্ঞান-স্বরূপ এবং তিনি নিত্য বর্ত্তমান এ কথা আমি একেবারেই অকাট্য বলিয়া মানি। "কথমসতঃ সৎ জায়েত" অসৎ হইতে কিরূপে সৎ উৎপন্ন হইবে—এইটিই আমার প্রথম প্রস্তাব। উৎপন্ন যাহা কিছু তাহা অবশ্যই কোন না কোন সদ্বস্তুর শক্তি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে—শূন্য হইতে অকস্মাৎ উৎপন্ন হয় নাই। উৎপন্ন জীব যত আছে তাহাদের উৎপত্তির পূর্ব্বে যখন কোন জীবই ছিল না, তখনও আকাশ ছিল—কাল ছিল—এবং আকাশ ও কাল কোন-না-কোন সত্তা এবং শক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। এইটিই প্রথম প্রস্তাব। দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে, সত্তা জ্ঞানকে ছাড়িয়া একাকী থাকিতে পারে না। তোমার আমার যদি জ্ঞান না থাকে তবে তোমার আমার সমক্ষে যেমন কোন অস্তিত্বই থাকিতে পারে না; সেইরূপ মূলেই যদি জ্ঞান না থাকে, তবে মূলেই কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যাহা কেহই কোনকালে জানে নাই, জানে না, জানিবে না, তাহার অস্তিত্ব কেবল মুখের একটা কথামাত্র—তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন জীবই যখন উৎপন্ন হয় নাই, তখন জগতের সত্তা কাহার জ্ঞানে বিদ্যমান ছিল? সে সত্তা কাহারো জ্ঞানে বিদ্যমান ছিল না বলাও যা, আর, তাহা কোথাও বিদ্যমান ছিল না বলাও তা, একই কথা; সত্তার অর্থই—বিদ্যমানতা; বিদ্যমানতা অর্থাৎ জ্ঞায়-

মানতা—জ্ঞানে প্রকাশমানতা; বিদধাতু এবং জ্ঞা ধাতু দুয়ের একই অর্থ। অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে নিত্য সত্তা বিদ্যমান ছিল, ইহার অর্থই এই যে, তাহা নিত্য জ্ঞানে বিদ্যমান ছিল। যিনি অসীম আকাশ-ব্যাপী সত্তার সাক্ষী তিনি মহান্ আত্মা, এবং যিনি সেই সত্তার নিত্য নিয়ামক তিনি জন্ম-বিহীন আত্মা, ইহাতে আর সংশয় কি?

অদ্বৈতবাদী॥ ইহা তবে তুমি মানো যে, এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় জন্ম-বিহীন মহান্ আত্মা ছিলেন; তবেই তো হইল যে, তিনিই কেবল একাকী ছিলেন, তদ্ভিন্ন আর কিছুই ছিল না—ইদং ছিল না—ইদম্বৃত্তিও ছিল না; এ কথার তুমি কি উত্তর দেও?

দ্বৈতবাদী॥ ও কথার উত্তর তিনটি কথায় পর্য্যবসিত;—(১) যদি জ্ঞান স্বীকার কর, তবে তাহার সঙ্গে অহম্বৃত্তি এবং ইদংবৃত্তি দুইই স্বীকার কর; (২) যদি জ্ঞান অস্বীকার কর, তবে তাহার সঙ্গে অহম্বৃত্তি এবং ইদংবৃত্তি দুইই অস্বীকার কর; (৩) কিন্তু যদি জ্ঞান স্বীকার কর অথচ অহম্বৃত্তি এবং ইদম্বৃত্তি অস্বীকার কর—যদি বল যে, পত্র আছে কিন্তু তাহার পৃষ্ঠা নাই—তবে আমি কেবল এইমাত্র বলিয়াই মৌন অবলম্বন করিব যে, সে জ্ঞান জ্ঞানই নহে—সে পত্র পত্রই নহে। এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না ইহা আমি মানি, কিন্তু ঐশ্বরিক জ্ঞানের ইদম্বৃত্তি ছিল না ইহা আমি মানি না। যদি বল যে, জীব-জ্ঞানেই অহম্বৃত্তি এবং ইদম্বৃত্তি আছে, কিন্তু ঐশ্বরিক জ্ঞানে উভয়ের কোনটিই নাই, তবে কেন বল না যে, চন্দ্রালোকই কেবল আপনাকে এবং পৃথিবীকে প্রকাশ করে, সূর্য্যালোক আপনাকেও প্রকাশ করে না—পৃথিবীকেও প্রকাশ করে না। চন্দ্র যে আপনাকে প্রকাশ করে এবং পৃথিবীকে প্রকাশ করে, তাহা সে সূর্য্যের নিকট হইতেই শিক্ষা করিয়াছে; জীবের জ্ঞান যে, আপনাকে এবং অন্যকে প্রকাশ করে, তাহা ঐশ্বরিক জ্ঞানেরই অনুকৃতি; ঐশ্বরিক জ্ঞানের অহম্বৃত্তি এবং ইদম্বৃত্তিই মূল-বৃত্তি, জীবের অহম্বৃত্তি এবং ইদম্বৃত্তি তাহারই অনুবৃত্তি; সূর্য্যের ভাস্বরতা এবং ভাসকতা মূল-প্রকাশ, চন্দ্রের ভাস্বরতা এবং ভাসকতা তাহারই অনুপ্রকাশ। সূর্য্যের আলোক কি অন্ধকারের ন্যায় প্রকাশ-শূন্য! ঐশ্বরিক জ্ঞান কি জড়ের ন্যায় বৃত্তি-শূন্য! ইহা হইতেই পারে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শুধু যে কেবল জড়-বস্তুই অনাত্ম-বিষয় তাহা নহে; দৃশ্য বিষয়ও যেমন অনাত্ম-বিষয়—মনোময় ভাবনার বিষয়ও সেইরূপ অনাত্ম বিষয়; জ্ঞানের যে বৃত্তি অনাত্ম-বিষয় লইয়া ব্যাপৃত হয় তাহাই ইদম্বৃত্তি—তা সে দৃশ্য বিষয় লইয়াই ব্যাপৃত হউক, আর, মনোময় বিষয় লইয়াই ব্যাপৃত হউক, তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। তুমি বেদের যে-বচনটি উদ্ধৃত করিলে তাহার অব্যবহিত পরেই আছে

"স তপো হতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।"

তিনি বিশ্ব সৃজনের আলোচনা করিলেন, তিনি আলোচনা করিয়া এই সমুদায় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন।

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই জগৎ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও তাহা ঈশ্বরের আলোচনায় বিদ্যমান ছিল। বেদে যাহা ইদং বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমাদের এখনকার এই ইদং—এই সৃষ্ট জগৎ; কিন্তু এটি ভুলিলে চলিবে না যে, এই সৃষ্ট জগতের মূলে ঈশ্বরের আলোচনা-জগৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে;—সৃষ্টির পূর্ব্বেও তাহা বর্ত্তমান ছিল—এখনো তাহা বর্ত্তমান আছে—এবং চির-

কালই তাহা বর্ত্তমান থাকিবে। জ্ঞান-ক্রিয়ার দুইরূপ পদ্ধতি; একরূপ পদ্ধতি এই যে, অগ্রে প্রত্যক্ষ-বৃত্তি পরিস্ফুট হয়, পরে মনোবৃত্তি পরিস্ফুট হয়, পরে ধীবৃত্তি পরিস্ফুট হয়; ইহা কালিক ক্রম-পদ্ধতি। আর একরূপ পদ্ধতি এই যে, প্রত্যক্ষ-বৃত্তি মনোবৃত্তির আশ্রয় সাপেক্ষ, মনোবৃত্তি ধীবৃত্তির আশ্রয়-সাপেক্ষ,—ইহা তাত্ত্বিক পদ্ধতি। কালিক বিচারে অগ্রে প্রত্যক্ষ এবং বহির্জগৎ, পরে মন এবং অন্তর্জগৎ, পরে ধীবৃত্তি এবং আত্মা; তাত্ত্বিক বিচারে—অগ্রে আশ্রয় পরে আশ্রিত—অগ্রে আত্মা এবং ধীবৃত্তি, পরে মন এবং অন্তর্জগৎ, পরে প্রত্যক্ষ এবং বহির্জগৎ। ঈশ্বর কালের পরপার-স্থিত, এ জন্য কালিক বিচার তাঁহার সহিত সংলগ্ন হয় না; ঈশ্বরের সৃষ্টি-ক্রিয়ার সম্বন্ধে অগ্রে অন্তর্জগৎ পরে বহির্জগৎ, এই তাত্ত্বিক পদ্ধতিই সবিশেষ সংলগ্ন হয়। ঈশ্বরের আলোচনা-জগৎ তাঁহার ধী-শক্তির ফল, এবং এই বহির্জগৎ তাঁহার উৎপাদিকা শক্তির ফল; উভয়ই ইদং শব্দের বাচ্য। শাস্ত্রাদির অনেক স্থলে এরূপ পাওয়া যায় যে, এ জগৎ ত্রিগুণাত্মক কিন্তু ঈশ্বরের আলোচনা-জগৎ শুদ্ধ কেবল সত্ত্ব-গুণাত্মক—কেননা সে জগতে সকলই সুপ্রকাশ—কিছুই অপ্রকাশ নাই। শাস্ত্রানুসারে, আমাদের অন্তর্জগৎ মলিন-সত্ত্ব, অর্থাৎ অপ্রকাশ এবং চাঞ্চল্য দ্বারা কলুষিত অবিশুদ্ধ প্রকাশ, এক কথায়—মন; ঈশ্বরের অন্তর্জগৎ শুদ্ধ সত্ত্ব—অর্থাৎ সর্ব্ব-বিষয়ক পূর্ণ প্রকাশ। সেই শুদ্ধ সত্ত্বই ঈশ্বরের ইদংবৃত্তির আদিম বিষয়। আদিম বিষয় না বলিয়া মূলতম বিষয় বলিলে আরো ঠিক্ হয়—কেননা আমাদের এখানকার কালিক বিচার ঈশ্বরের মহান্ সৃষ্টি ব্যাপারের সহিত সংলগ্ন হয় না। শুদ্ধ সত্ত্ব—ঈশ্বরের ইদম্বৃত্তিরই বিষয়, সুতরাং তাহা নিয়ম্য এবং পরমাত্মা তাহার নিয়ামক; মলিন-সত্ত্ব (অর্থাৎ আমাদের মন) সেই শুদ্ধ সত্ত্বেরই প্রতিকৃতি, এবং জীবাত্মা পরমাত্মারই প্রতিকৃতি; সুতরাং মলিন সত্ত্ব নিয়ম্য এবং জীবাত্মা তাহার নিয়ামক। ঈশ্বরের নিয়ম্য ইদংবৃত্তিকে এবং তাহার সঙ্গে তাঁহার নিয়ামিকা শক্তিকে ঈশ্বর হইতে পৃথক করিয়া শুদ্ধ কেবল তাঁহার অহম্বৃত্তির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে যাহা পাওয়া যায়, জীবেরও নিয়ম্য ইদম্বৃত্তিকে এবং তাহার সঙ্গে তাহার নিয়ামিকা-শক্তিকে জীব হইতে পৃথক্ করিয়া শুদ্ধ কেবল তাহার অহম্বৃত্তির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে অবিকল তাহাই পাওয়া যায়; কিন্তু সে যাহা পাওয়া যায়—তাহা এমনি একটি পত্র যাহার কেবল একটি মাত্র পৃষ্ঠা—অর্থাৎ যাহা আকাশ-কুসুম অপেক্ষাও অসঙ্গত ব্যাপার। ঈশ্বরের সহিত জীবের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা পরিষ্কার-রূপে বুঝিতে হইলে ঈশ্বরের ঐশী শক্তি এবং জীবের কর্ত্তৃত্ব শক্তির মধ্যে—ঈশ্বরের পরিপূর্ণ আনন্দময় শুদ্ধ সত্ত্ব এবং জীবের সুখ-দুঃখ-মোহাক্রান্ত মনের মধ্যে—কিরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ তাহা হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। ঈশ্বরের ইদম্বৃত্তি মূল আদর্শ, আমাদের ইদংবৃত্তি তাহার অনুলিপি মাত্র। ঈশ্বর সংসারের পরপারে থাকিয়া যেরূপ লেখা লিখিতেছেন, আমরা সংসারের এ পারে থাকিয়া তাহারই দাগা বুলাইতেছি। বিজ্ঞান-বিৎ পণ্ডিতেরা ঈশ্বরের চিন্তা হইতেই চিন্তা শিক্ষা করেন, কবিরা ঈশ্বরের রচনা হইতেই রচনা শিক্ষা করেন, মনীষী মহাত্মারা ঈশ্বরের ঐশীশক্তি হইতেই ঈশিতা এবং বশিতা শিক্ষা করেন। ঈশ্বরের ঐশীশক্তিই মূল শক্তি, তাঁহার ইদম্বৃত্তিই মূল ইদংবৃত্তি,—তাহার জন্য ঈশ্বর অন্য কাহারো নিকট ঋণী নহেন; তাহা

সর্ব্বাংশে তাঁহার আপনার, এজন্য তাহা সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন। আমাদের ইদম্বৃত্তি সম্যক্‌রূপে আমাদের অধীন না হওয়াতে আমরা কখনো বা দুঃখে, কখনও বা মোহে, আক্রান্ত হই; এবং আমাদের শক্তির অপূর্ণতাবশতঃ—তাহা অতিক্রম করিতে কখনও বা পারি, কখনো বা পারি না। পরমাত্মার ইদম্বৃত্তি তাঁহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীন সুতরাং তিনি পরিপূর্ণ আনন্দময়। যে ব্যক্তি যত তাহার পরাধীন ইদম্বৃত্তিকে (অর্থাৎ মনোরৃত্তিকে) সংযত করিয়া ঈশ্বরের ভাবের ভাবুক হয়, সে ব্যক্তির আত্মাতে ততই ঐশী শক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাহার কর্ত্তৃত্ব-শক্তিকে দ্বিগুণিত করিয়া তোলে। মনুষ্য যতই ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ এবং ভক্তিমান্ হইয়া কায়মনো-বাক্যে তাঁহার অনুগত হয়, ততই তাহার নিয়ামিকা শক্তি প্রবর্দ্ধিত হয়; ততই সে তাহার ইদম্বৃত্তির উপর কর্ত্তৃত্ব লাভ করে; ততই সে দুঃখ এবং মোহের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আনন্দামৃত উপভোগ করে। কিন্তু মনুষ্য যতই উৎকর্ষ লাভ করুক্ না কেন, ঈশ্বর তাহা অপেক্ষাও পরাৎপর পরম উৎকৃষ্ট; এ জন্য মনুষ্যের নিজের আত্মোৎকর্ষ মনুষ্যের চরম লক্ষ্যের উপযুক্ত নহে, এক কথায়—চরম আদর্শ নহে। ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতিই সাধকের মুখ্য লক্ষ্য, তাহার আপনার উৎকর্ষ তাহার আনুষঙ্গিক উপলক্ষ। সেই মুখ্য লক্ষের সাধনই মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চ কার্য্য; মনুষ্যের আত্মার উৎকর্ষ যাহা সেই লক্ষ্য-সাধনের অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহাও সেই লক্ষ্যেরই উচ্চতর সাধনের সহায় বলিয়া সমধিক প্রার্থনীয়। ঈশ্বর আমাদের আত্মার উৎকর্ষের জন্য নহেন, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধনের জন্যই আত্মার উৎকর্ষ-সাধন, এইরূপ হইলেই সাধক ঠিক্ পথে দাঁড়ায়। নিষ্কাম ঈশ্বর-প্রীতিই মনুষ্য জীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ।

ব্রাহ্মসমাজ ও অক্ষয়কুমার দত্ত।

আমরা সম্প্রতি মৃত অক্ষয়কুমার দত্তের একখানি জীবনচরিত দেখিলাম। এই পুস্তক তাঁহার জীবদ্দশায় রচিত এবং ইহার অনেক উপকরণ তাঁহারই প্রদত্ত; এই জন্য বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত তাহা পাঠ করিলাম। কিন্তু দেখিলাম, চরিতাখ্যায়ক অনেক স্থলে ভ্রম প্রমাদের হস্ত এড়াইতে পারেন নাই। এস্থলে প্রসঙ্গত একটা কথার উল্লেখ আবশ্যক হইল। চরিতাখ্যায়ক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া উপহার স্বরূপ একখানা আমাদিগকে দেন নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত যখন অক্ষয় বাবুর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, তখন তাঁহার জীবনী আমরা পাইবার সম্পূর্ণ একটা আশা রাখি। না দিবার গূঢ় কারণ যাহাই হউক কিন্তু ঘটনা ক্রমে আমরা তাঁহার জীবনচরিত দেখিলাম। পাঠ করিয়া এই জন্য বিস্মিত হইলাম যে যখন অক্ষয় বাবু নিজে জীবনীর উপকরণ দিয়াছেন, তখন এরূপ ভ্রম প্রমাদ ইহার ভিতর কি রূপে স্থান পাইল। ফলত ইহাতে অক্ষয় বাবুর সম্পূর্ণ সাহায্য আছে বলিয়া এই গ্রন্থপাঠে আমাদের প্রয়াস এবং ইহার ভ্রান্তি প্রদর্শনে আমাদের এই প্রস্তাবের অবতারণা। কিন্তু এই গ্রন্থে ভ্রমের সংখ্যা অল্প নয়। সকল ভ্রম দেখাইতে আমাদের সময় নাই, আবশ্যকও নাই। কোনও মহাত্মার জীবন চরিতের সহিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তের বিশেষ সংযোগ আছে। যখন তাহা প্রকাশ হইবে, তাহা দ্বারা আলোচ্য গ্রন্থের দোষগুলি লোকে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। আমরা আপাতত কএকটা স্থূল স্থূল বিষয়ের ভ্রান্তি দেখাইয়া ক্ষান্ত হইব।

অক্ষয়কুমারের চরিতাখ্যায়ক বলিয়াছেন, শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বৈদান্তিক ছিলেন এবং তিনি বেদের অভ্রান্ততা স্বীকার করিতেন। তাঁহার মতেই সমাজের সকলের মত। কারণ তিনিই সকল বিষয়ের কর্ত্তা। অক্ষয় বাবু যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হন, তখন সর্ব্বাগ্রে সমাজের ধর্ম্মমত অবিশুদ্ধ দেখিয়া মনে করিলেন, শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রান্তি দূর করিতে পারিলেই সমাজের ভ্রান্তি দূর করা হইবে। এই মনে করিয়া অক্ষয় বাবু কিছু কাল ধরিয়া তাঁহার সহিত তর্ক বিতর্ক করেন এবং বৈদান্তিক ধর্ম্মে ও বেদে ভ্রান্তি প্রদর্শন করেন।

চরিতাখ্যায়ক এই কথা লইয়া অক্ষয় বাবুর খুব গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা পাইয়াছেন কিন্তু ইহার ভিতর সত্য কি তাহার কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। এস্থলে আমরা তাহাই বলিতেছি শুনুন। কোনও একটী আকস্মিক ঘটনায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে এক সময় ঘোর একটী ঔদাস্যের ভাব উপস্থিত হয়। তন্নিবন্ধন তিনি পার্থিব সুখে অতৃপ্ত হইয়া কিছুকাল নির্জ্জনে ধর্ম্মানুসন্ধান করেন এবং স্বচেষ্টায় আত্মার মধ্যে তাহার অনন্ত উৎস দেখিতে পান। তখনও ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার সংযোগ ঘটে নাই এবং তথাকার ধর্ম্মই বা কি তাহারও কিছু জানেন না। একদা তিনি বাড়ির মধ্যে বসিয়া আছেন এমন সময় একটা পুথির পাতা বায়ুবেগে ওলট পালট খাইয়া তাঁহার সম্মুখ দিয়া যায়। ঔৎসুক্য বশত তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ কোন অধিকার জন্মে নাই। সুতরাং ঐ পত্রে কি লেখা আছে, তাহা বুঝিবার জন্য সুপণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে ডাকেন এবং বিদ্যাবাগীশ আসিয়া তাহা ব্যাখ্যা করেন। ঐ পত্র ঈষোপনিষদের প্রারম্ভ। শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার দুই একটী মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিবামাত্র এই জন্য বিস্মিত হইলেন যে তিনি স্বচেষ্টায় যেরূপ ঈশ্বরের স্বরূপ অবধারণ করিয়াছেন, এই গ্রন্থে সুস্পষ্ট তাহাই আছে। তখন রত্ন-অনুসন্ধিৎসুর রত্নের খনি-লাভের আনন্দ উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন, বেদের অন্তভাগে যখন এই, না জানি সমস্ত বেদে কি অমূল্য পদার্থ আছে। এইরূপ অনুরাগ ও আগ্রহে সমস্ত বেদ জানিতে তাঁহার ইচ্ছা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ব্যয়ভার স্বীকার করিয়া কএকটী লোককে সমগ্র বেদ পড়িবার জন্য বারানসীতে পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং ও শিক্ষার সাহায্যে ঐ সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু কাল অতিবাহিত হইয়া যায় এবং ঐ সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ ও অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত তাঁহার সংযোগ হয়। তখন সমাজ মধ্যে লোকের বেদের নিত্যতায় বিশ্বাস ও বৈদান্তিক ধর্ম্ম অবলম্বনীয় ছিল। এই বিশ্বাস ও এই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের মূল রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। আমরা পুর্ব্ব পুর্ব্ব প্রস্তাবে তাঁহারই বাক্যে এই বিষয় সপ্রমাণ করিয়াছি। অতঃপর এই বেদ ও বেদান্ত লইয়া শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত অক্ষয়কুমার দত্তের তুমুল তর্ক উপস্থিত হয়। আমরা ইতি পুর্ব্বেই বলিলাম শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈষোপনিষদে আপনার সহজ বিশ্বাসের প্রতিচ্ছায়া পাইয়া বেদ ও বেদান্তে একটী অটল শ্রদ্ধা স্থাপন করেন। সমগ্র বেদে যে কত অমৃত আছে, তাহা পান করিবার জন্য ঐ ধর্ম্ম-পিপাসুর একটা প্রাণের পিপাসা হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বেদের উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধার আরও দুইটী কারণ ছিল। প্রথম, স্বদেশানুরাগ। বেদ এ দেশের সর্ব্ব

পূজ্য ও সর্ব্বপ্রাচীন পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্র। স্মরণাতীত কাল হইতে কোটি কোটি লোক যাহার নামে মস্তক অবনত করে, দিবসের প্রারম্ভ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে সমগ্র না হউক অন্তত যাহার কএকটী মন্ত্র ভক্তির সহিত উচ্চারণ না করিয়া এই বিশাল রাজ্যের কোটি কোটি লোক আজিও জীবন-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় না, ভারতের ধর্ম্ম-সংস্থাপক ও ধর্ম্ম-রক্ষক ব্রাহ্মণের বংশে জন্মিয়া শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বভাবতই সেই বেদ রক্ষার্থ একটী অন্তরের যত্ন দাঁড়াইয়া ছিল। দ্বিতীয়ত তিনি মনে করিয়াছিলেন, রাগ দ্বেষ শূন্য সহজ জ্ঞানে যে ধর্ম্মের অনুমিতি হয়, যদি সমগ্র বেদে তাহাই পাই, তবে তো এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের আর কোনও অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে না। কারণ বেদ সকলেরই পূজ্য ও শিরোধার্য্য। একজন ধর্ম্মপ্রাণ ও বিচক্ষণ লোকের ধর্ম্মসংস্কার ও ধর্ম্মপ্রচারে যেরূপ প্রণালী আশ্রয় করা উচিত, শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু অক্ষয় বাবুর প্রকৃতি স্বতন্ত্র। তিনি পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত। এখনকার অনেক পাশ্চাত্য জ্ঞানাভিমানীর ন্যায় তাঁহারও না জানিয়া ও না পড়িয়া বেদে একটী ঘোর বিদ্বেষ ছিল। তাঁহার প্রাণগত ইচ্ছা যে তিনি ব্রাহ্মসমাজকে পাশ্চাত্য বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্র করিয়া তুলেন। কিন্তু বেদ তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাতক। এই বেদকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার ব্যাপক কাল তর্ক হয়। এক জন খনী খনন করিতে গিয়া তন্মধ্যগত রত্নপ্রভায় মোহিত ও রত্নোদ্ধারে কৃতপ্রযত্ন, এবং আর একজন তন্মধ্যে রত্ন দেখিলেন না, তৎসত্ত্বায়ও বিশ্বাস করিলেন না, তিনি কেবল দূরে থাকিয়া তাহাকে খনি প্রবেশে নিষেধ করিতেছেন; এই তুমুল তর্কের এই টুকুই রহস্য। ফলত এই তর্ক দ্বারা নয় কিন্তু নিজের আলোচনায় এবং বারাণসী হইতে প্রত্যাগত বেদজ্ঞদিগের বেদ ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বুঝিলেন, কর্ম্ম ও জ্ঞান এই উভয় কাণ্ডাত্মক বেদের সমগ্র নয় কেবল সত্য জ্ঞানই লোকের মুক্তির জন্য প্রচার করা আবশ্যক। তখন বহু দিনের নির্জ্জন চিন্তায় সহজ জ্ঞানে তাঁহার যে ধর্ম্মের অনুমিতি হইয়াছিল, তিনি উপনিষদ হইতে তাহারই অনুকূল মন্ত্র সকল অগ্নিময় ভাষায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত সঙ্কলিত মন্ত্রই বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের জ্ঞান কাণ্ড।

এইরূপে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল স্বদেশানুরাগ ও অটল ধর্ম্ম-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে বেদ বেদান্তের মর্য্যাদা রক্ষা করেন এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ হইতে এতৎ সংক্রান্ত যে সমস্ত ভ্রান্ত সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছিল, আত্মতত্ত্ব বিদ্যা নামক পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা দ্বারা তাহা অল্পে অল্পে দূর করিয়া দেন। পাশ্চাত্য-জ্ঞান-দৃপ্ত অক্ষয়কুমার এইরূপে যদিও ভগ্ন-মনোরথ হইলেন কিন্তু এখনও তিনি নিরস্ত হন নাই। তিনি উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠিত বেদোক্ত মন্ত্রে ব্রহ্মোপাসনার উপর আক্রমণ করিলেন। কি ভয়ানক আসুরিক বেদ-বিদ্বেষ! কিন্তু যে বেদোক্ত স্তুতি ও গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা যুগ যুগান্তের ঋষিগণ ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মলাভ করিয়াছেন, এই ভারতের রক্তে প্রতিপালিত হইয়া জানি না কোন্ ধর্ম্মকাম হৃদয়বান্ ব্যক্তির তাহার প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি জন্মিতে পারে। আমরা পূর্ব্বতন ঋষিদিগের তুলনায় সাধন-বিহীন ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতর। আমরা সেই অচিন্ত্যরূপ ব্রহ্মকে নূতন কি আর বলিব, কি স্তব করিব, তবে যদি ঋষিদিগের সেই পবিত্র

উচ্ছ্বাসে আপনার উচ্ছ্বাস কথঞ্চিৎ মিশাইতে পারি, এইটুকুই আমাদিগের পরম লাভ। আমরা ব্রহ্মস্তুতি ও ব্রহ্মপূজার সম্বন্ধে এই মাত্রই বুঝি। কিন্তু অক্ষয়কুমারের তাহা সহিত না। তিনি বেদমন্ত্রের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মসমাজে কেবল বাঙ্গালা ভাষায় নির্জীব উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে বহু আয়াসেও কৃতকার্য্য হন নাই। আশ্চর্য্য! যে সমস্ত বেদমন্ত্রে প্রাচীন নিরাকাঙ্ক্ষ ও নিঃসঙ্গ লোকদিগের ধর্ম্মভাব জ্বলৎ ও জীবন্ত অক্ষরে প্রস্ফুটিত, যে সমস্ত মন্ত্র কোটি কোটি সাধককে পৃথিবীর পাপ তাপ জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্তির পথে লইয়া গিয়াছে, যে সমস্ত মন্ত্র যুগযুগান্তের নানা রূপ ভাব-সংস্রবে কবি-হৃদয়ের একটী স্পৃহনীয় পদার্থ হইয়া আছে; জানি না, যাঁহারা কঠোরতার বলে পুরুষার্থ লাভে ব্রতী তাঁহারা আজ কি জন্য সেই সমস্ত বেদমন্ত্র অল্পায়াসে বোধ-সুলভ করিতেও কাতর। ফলত এই বিষয় যত চিন্তা করি, ততই ইহা দ্বারা আধুনিক লোকের স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-স্নেহের একান্ত অভাবেরই পরিচয় পাই।

উপরে যাহা প্রদর্শন করিলাম, চরিতাখ্যায়ক বুঝিবেন, ইহাতে অক্ষয়কুমারের কিছুমাত্র বিজয়ীর গৌরব নাই। ফলত শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই ব্রাহ্মসমাজকে এই সমস্ত মহা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এই সূত্র ধরিয়া আজ কাল অনেক ব্রাহ্ম প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই ব্রাহ্ম ধর্ম্মে হিন্দু সঙ্কীর্ণতা আনিয়াছেন। হিন্দু সঙ্কীর্ণতা নামে এই যে একটী ইঙ্গবঙ্গীয় কথা, ইহার যে প্রকৃত অর্থ কি, কি উদ্দেশে যে ইহা প্রযুক্ত, আমরা ঠিক তাহা বুঝিতে পারি না। এমন হইতে পারে, এখন যেরূপ কোরাণ বাইবেল প্রভৃতির সত্য লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের একটা ব্যাপকতা প্রদর্শিত হইয়া থাকে, শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা দেখান না। বোধ হয় এই অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে যে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে হিন্দুসঙ্কীর্ণতা আনিয়াছেন। কিন্তু আমরা এ কথারও অর্থ বুঝি না। কারণ প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম বর্ত্তমান প্রচলিত কএকটি ধর্ম্ম অপেক্ষা অসংখ্য গুণে উদার। ইহা কোন ধর্ম্মকেই দ্বেষ করে না। তবে তুমি বলিতে পার, ইহা যদি অন্য ধর্ম্মের বিদ্বেষী নয়, তবে অন্য ধর্ম্মের সত্য ইহার নিকট আদরণীয় হয় নাই কেন। এইটী তোমার খুব বুঝিবার ভুল। অন্য ধর্ম্মের সত্য হিন্দুধর্ম্মে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণ বেদদ্বেষী ধর্ম্ম। কিন্তু যখন বৌদ্ধাচার্য্যেরা হিন্দু দার্শনিকদিগের নিকট পরাস্ত হয়, যখন এ দেশে ঐ ধর্ম্মের উচ্ছেদ-দশা উপস্থিত, সেই সময় বৌদ্ধধর্ম্মের সত্য প্রচুর পরিমাণে হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে। এ বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের দ্বার অতি উদার। তবে তুমি বলিতে পার, ভিন্ন দেশীয় ধর্ম্মের সত্য ইহাতে নাই কেন। এ বিষয়েও আমার উত্তর আছে। যখন হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়-কাল, তখন পৃথিবীতে কোন ধর্ম্মেরই সৃষ্টি হয় নাই। যদি তখন আর কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম থাকিত এবং তাহার সত্য যদি গ্রহণ-যোগ্য হইত, তাহা হইলে এই ধর্ম্ম যে তাহা লইত না, ইহা তোমাকে কে বলিল। আমি এ কথা প্রমাণ-নিরপেক্ষ হইয়া বলিতেছি না। দেখ, ষড়ঙ্গ বেদের জ্যোতিষ্ একটী অঙ্গ। হিন্দুরা এই অঙ্গ পুষ্টির নিমিত্ত কোন রোমকাচার্য্যের নিকট অনেক জ্যোতিষিক সত্য গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা দ্বারাই বোধ হয়, যদি তৎকালে আর কোন ধর্ম্ম থাকিত তাহার সত্য গ্রহণ করা হিন্দুধর্ম্মের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। আমরা যে কথার প্রসঙ্গ করি-

তেছি, ইহা অনৈতিহাসিক কালের কথা। সেই সময় হিন্দুধর্ম্মের কি হইয়াছিল, না হইয়াছিল, সকলটা জানিবার জো নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বোধ হয়, যে জাতি বহির্ব্যাপারে এক রূপ বিমুখ হইয়া কেবল আত্মোন্নতিকেই জীবনের সার জ্ঞান করিয়াছিল, সেই জাতি যে কোন স্থানেই সত্য থাক্ না তাহার যে অসমাদর করিবে, ইহা কিছুতেই সম্ভব মনে হয় না। ফলত এ বিষয়ে হিন্দু ধর্ম্মের দ্বার খুব উন্মুক্ত ছিল। উহা এই রূপ উদার বলিয়াই গীতাশ্রুতির জন্ম এবং তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে, যে যেরূপে ঈশ্বরকে ভজনা করে, ঈশ্বর সেইরূপেই তাহাকে অনুগ্রহ করিবেন; কারণ কেহই তাঁহার পথ ব্যতীত অন্য দিকে যায় না। এইটুকু হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বতোমুখী উদারতার ভাব। কিন্তু প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম্ম প্রাণান্তেও এরূপ বলিতে পারে না। সেই সমস্ত ধর্ম্মের মর্ম্ম কথা এই, তুমি আমার আশ্রয়ে আইস, তবেই তোমার মুক্তি। এতদ্ব্যতীত এই হিন্দু ধর্ম্মের বীজমন্ত্র সর্ব্বত্র সাম্য। এখন তুমি বলিতে পার তবে হিন্দুর মধ্যে এত জাতি-বিদ্বেষ কেন। আমি বলিব এইটা তোমার বুঝিবার ভুল। হিন্দুধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উদার কিন্তু ইহার যা কিছু নিরোধের ব্যাপার, তাহা আচারে। হিন্দুরা ধর্ম্মসাধনের জন্য অতি সতর্কতার সহিত আচারকে রক্ষা করিয়া থাকে। মদ্য গো-মাংস প্রভৃতি দ্রব্য শারীরিক তাপবৃদ্ধির কারণ। ইহা দ্বারা আত্ম-সংযমের ব্যাঘাত ঘটে। এইজন্য হিন্দুর শাস্ত্রোক্ত এই সকল নিষেধ মানিয়া চলা আবশ্যক। যে জাতিতে এই সমস্ত দ্রব্যের ব্যবহার, ইহারা তাহাকে ম্লেচ্ছ বা ভ্রষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করে এবং কস্মিন্ কালে কোন অংশে তাহাদের সহিত মিশে না। এই যে একটুকু বিদ্বেষের ভাব; ইহা জাতিগত নয়,জাতির আচারগত। তোমরা হিন্দুধর্ম্মের এই অংশকে সঙ্কীর্ণতা বলিতে চাও বল কিন্তু আমরা তাহা বলি না। যাহা দেশের জল বায়ুর অবস্থাভেদে ধর্ম্মসাধনের জন্য একান্ত অপরিহার্য্য আমরা তাহাকে সঙ্কীর্ণতা বলিতে পারি না। যাই হউক, হিন্দুরা বহু পূর্ব্বাবধি সকল জাতি হইতে যে একটা স্বাতন্ত্র অবলম্বন করিয়া আছে, এই আচারই তাহার মুখ্য কারণ। কিন্তু যে নদী বিশাল বক্ষে বহু কাল হইতে সমুদ্রের অভিমুখে চলিয়াছে, সংস্কার না থাকিলে কালক্রমে তাহারও কোন কোন স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। আমরা এই হিন্দু আচার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা অতীতের। কিন্তু হিন্দুর হস্তে যখন রাজ-নিয়ম নাই, ইহাদের মধ্যে যখন সংস্কারক নাই, তখন বর্ত্তমানে এই আচারে যে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণতা দাঁড়াইবে ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহার মূল নিয়ম নির্দোষ। স্বদেশানুরাগী স্বজাতি-বৎসল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্মকে সর্ব্বাংশে সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা এইরূপ উদার দেখিয়া একমাত্র তাহারই সত্যে বিশ্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম্মকে পুষ্ট করিয়াছেন। এই সূত্রটুকু ধরিয়া যে তোমরা বল তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে হিন্দু সঙ্কীর্ণতা আনিয়াছেন ইহা তোমাদিগের হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি না জানার পরিচয়। এস্থলে আরও একটু কথা আছে। পূর্ব্বের অনৈতিহাসিক কালের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছি যে যখন হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়, সে সময় যদি কোনও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম থাকিত এবং তাহার সত্য যদি গ্রহণ-যোগ্য হইত, তাহা হইলে সেই সত্যে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গপুষ্ট হওয়া অসম্ভব ছিল না। এইটুকু হিন্দুধর্ম্মের উদার প্রকৃতির পরিচয়। কিন্তু ফল কথা, হিন্দুর আত্মোন্নতির জন্য সত্য গ্রহণের আবশ্যকতা ছিল না এবং এখনও নাই। কারণ ঋষিরা

যেরূপ সাধনায় সত্য লাভ করিয়াছিলেন পৃথিবীর অন্য কোন জাতি কি সেরূপ সাধনায় কখন সত্যের আরাধনা করিয়াছিল? এতদ্দেশের সেই বিশেষ অবস্থায় যে সমস্ত উজ্জ্বল সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার তুলনায় সকল দেশের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্য কি নিতান্ত নিষ্প্রভ নয়? উপনিষদের তুল্য ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদক গ্রন্থ কি আর আছে? তবে বাহিরে হস্ত প্রসারণের আবশ্যকতা কি? গৃহে মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণা কিন্তু জঠরজ্বালা নিবারণের জন্য অন্যের দ্বারে ভিক্ষা, ইহা কিরূপ উদারতা। শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বুঝিয়াই ভিন্ন জাতীয় ধর্ম্ম গ্রন্থের সত্যে একটা আকাঙ্ক্ষা রাখেন নাই। তবে তোমরা বলিতে পার ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন সাম্প্রদায়িক নয়, ইহা বিশ্বজনীন ধর্ম্ম, তখন সকল জাতির সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্য ইহাতে সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এবিষয়েও আমাদের বক্তব্য আছে। মুক্তির নিমিত্ত জ্ঞান ও ভক্তি দুইই চাই। জ্ঞানের উজ্জ্বল ও অক্ষয় ভাণ্ডার বেদ বেদান্ত। আর ভক্তি আমার পুরুষকার-সাধ্য। আমার চেষ্টা থাকিলেই তাহা হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় পঞ্চশস্য সংগ্রহ করা ধর্ম্মের একটা ব্যবসাদারি ভিন্ন আর কিছুই নয়। তবে তোমরা বলিতে পার, পৃথিবীর সকল জাতিকে ব্রাহ্মধর্ম্মে আকর্ষণ করা আমাদের লক্ষ্য। এই জন্য সকল জাতির সকল ধর্ম্ম গ্রন্থের সত্য সংগ্রহ ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশেষ প্রয়োজন। প্রত্যুত্তরে আমি বলিব, আবার যদি বুদ্ধ বা চৈতন্যের ন্যায় একজন চরিত্রবান্ লোক জন্মেন, তবে তাঁহার মুখে সকল জাতিকে এক করিবার এই একটা দম্ভের কথা শোভা পায়; কিন্তু যখন তোমরা স্বগৃহে ভ্রাতায় ভ্রাতায় এক হইতে পারিলে না, তোমাদের মুখে ওরূপ দম্ভের কথা আর শোভা পায় না। এখন স্বদেশের অসংখ্য লোক প্রকৃত ধর্ম্মের অভাবে হাহাকার করিতেছে। আগে তাহাদিগকে শান্ত কর, পরে বিদেশ। কিন্তু বলিতে কি, তোমরা নানা উপকরণে ধর্ম্মের যে এক অদ্ভুত খিচুড়ি পাকাইয়াছ, তাহার নামে স্বদেশের লোক তাহার ত্রিসীমায় আসিতে চায় না। হায় এই কি তোমাদের স্বদেশানুরাগ।

যাক্, এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ আবশ্যক। চরিতাখ্যায়ক বলিয়াছেন; একবার, জগদ্বন্ধু পত্রিকায় বেদ অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র নয়, এই কথা লেখা হইয়াছিল। অক্ষয় বাবু তাহার প্রতিবাদে অস্বীকার করাতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সেই মত খণ্ডন করেন। জগদ্বন্ধু পত্রিকায় যে কি লেখা হইয়াছিল, এখন তাহা জানিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমরা চরিতাখ্যায়কের নির্দ্দেশ ক্রমে তত্ত্ববোধিনীর প্রত্যুত্তর পাঠ করিয়া দেখিলাম। এ বিষয়ে যাহা বক্তব্য, তাহা পরে বলিতেছি; কিন্তু অগ্রে জিজ্ঞাস্য, জগদ্বন্ধু পত্রিকার প্রতিবাদ যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর করিয়াছিলেন, এ কথার মূল কি? চরিতাখ্যায়ক, বলিবেন, ইহা অক্ষয় বাবুর মুখের কথা। কিন্তু চরিতাখ্যায়ক জানিবেন, মুখের কথা যথা তথা খাটে না। প্রামাণিক কাল, প্রমাণ অপেক্ষা করে। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ লোকের মনে বেদান্ত ও বেদসংক্রান্ত একটা ভ্রান্ত সংস্কার বদ্ধমূল করিয়া যান। শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাজে যোগ দিয়া ক্রমশ সেই সংস্কার দূর করিয়াছিলেন। কিন্তু চরিতাখ্যায়কের বাক্য-প্রমাণে জগদ্বন্ধু পত্রিকায় 'কস্যচিৎ জিজ্ঞাসোঃ' স্বাক্ষরকারীর প্রত্যুত্তরে তত্ত্ববোধিনীতে যাহা লেখা হইয়াছিল; যদি তাহা

শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহাতেও বিশেষ দোষ দেখিতেছি না। ফলত জগদ্বন্ধু পত্রিকায় লিখিত অংশের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া চরিতাখ্যায়ক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভ্রান্ত বলিবার বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছেন। কিন্তু চরিতাখ্যায়ক দেখুন, জগদ্বন্ধু পত্রিকার প্রত্যুত্তরে কি বলা হইয়াছে। ইহাতে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সার এই—পরমেশ্বর মনুষ্য মাত্রেরই মনে সামান্যত ধর্ম্মজ্ঞানের সামর্থ প্রদান করিয়াছেন কিন্তু মোহ বা ভ্রান্তিবশতঃ তাহা কদাপি আচ্ছন্ন হয়; সকল সময়ে জ্ঞানের প্রকৃত স্ফূর্ত্তি হয় না। এই সময় মহাজনের বাক্য বিশেষ ফলোপধায়ক হইয়া থাকে। এই মহাজনকে তপস্বী ঋষিই বল বা বেদান্তের ব্রহ্মাই বল, তাঁহার কথিত বাক্য বা বেদ দীপবৎ মোহান্ধকার দূর করিয়া দেয়। এই প্রতিবাদের উপসংহারে এই একটী কথাও আছে—পক্ষপাত ও মোহশূন্য হইয়া বেদ-ভাবকে আলোচনা করিলে তন্মধ্যে যুক্তি-সাধ্য সমুদায় বিষয় আমাদিগের বুদ্ধিনিষ্পন্ন সিদ্ধান্তের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হয়। এই প্রকার প্রত্যুত্তরে যে কি দোষ, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ইহা অতি স্পষ্ট কথা যে সকলেরই হৃদয়ে ধর্ম্ম বুঝিবার শক্তি আছে, কিন্তু অবস্থা ও শিক্ষার দোষে সকলের এই শক্তির প্রকৃত স্ফূর্ত্তি হয় না। এই জন্য ঋষিবাক্য স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা আমাদের বুদ্ধিনিষ্পন্ন সিদ্ধান্তের সহিত ঐক্য করিয়া লওয়া আবশ্যক। চরিতাখ্যায়ক দেখিবেন, ইহাতে বেদের দাসত্ব করিবার কোন কথা বলা হয় নাই। ধর্ম্মে মনুষ্য-বুদ্ধিরই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আর ঐ প্রত্যুত্তরে যে ব্রহ্মা শব্দ আছে, তাহার টিপ্পনীতে ব্রহ্মা শব্দে ঈশ্বরের গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা দর্শনজ্ঞ দিগকে এই কথার ইঙ্গিত করা হইল যে প্রকৃতি ঈশ্বরের গুণ বা শক্তি। বেদান্তে তাহাই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মানামে অভিহিত আছে। এই প্রকৃতি অন্তর্বাহ্য ভেদে দুই প্রকার। ব্রহ্মাতে প্রথম বেদের আবির্ভাব ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য এই মনুষ্যের ধর্ম্ম-বোধ এই প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হয়। এখন চরিতাখ্যায়ক বুঝিয়া দেখুন তিনি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণের দ্বারা শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভ্রান্ত বলিয়া স্থির করিতে চান, তাঁহার বল কতদূর।

চরিতাখ্যায়ক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সাধারণের নিকট যেরূপ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাহা যে নিতান্ত অমূলক; এই স্থলে তাহার একটী সজীব প্রমাণ দেই। এবং ইহা দ্বারা ইহাও সপ্রমাণ হইবে যে অক্ষয় বাবু দ্বারা সমাজ হইতে বেদ-সংক্রান্ত ভ্রান্ত সংস্কার অপনীত হয় নাই। সজীব প্রমাণ ভক্তিভাজন বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বাবু। তিনি এক সময় এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

But we cannot approve of the length to which the thick and thin panegyrists of Akshoya Babu are going in their praise of those services. They say that he was the sole cause of the abandonment by the Somaj of the erroneous doctrine of the infallibility of the Vedas. Now the old Brahmos did not believe the revelation of the Vedas as they represent them to have done. We quote in support of our assertion the following passages from the Vedantic Doctrines Vindicated :

"The Vadas having existed from a time when Indian literature and, indeed, all literatures were only (as it were) in a state of germination, it is impossible to prove the divine origin of these sacred works by any historical testimonies, the value of which was not understood all the time, or indeed, by any other evidence than what they themselves afford

by the drift and tendeucy, *the reasonableness and cogency* of the doctrines taught in them."

"The only ground on which the truth of any system of belief can be maintained is that founded on the nature of the doctrines inculcated by it.

If the doctrines of theology and the principles of morality taught in the sacred volumes referred to appear to be consonant to the dictates of sound reason and wisdom, if these tenets and precepts carry the unimpeachable character of truth in them the man who has received them and continues to place his trust in them, will have no reason to fear the vituperative surmises of ungodliness in respect to his religion."

"The knowledge derived from the sources of inspiration deals with eternal truths, which require no other proof than what the whole creation and the mind of man unperverted by fallacious reasonings afford in abundance."

The above passages are quoted from the very pamphlet. in which the revelation of the Vedas is principally maintained. We quote another passage from a work published by a Christian Missionary no testimony can be more strong than this one afforded by the missionary of another religion.

Though the Brahmos claim the Vedas as a revelation of divine truth, they look primarily upon the works of nature as their religious teacher. From nature they learned first and because the Vedas, as they assert, agree with nature,therefore they regard them as inspired. Rev. Mullen's Essay on Vedantism Brahmoism and Christianity.

Now it was certainly not a heroic feat on the part of Akshay Babu to induce people whose opinions were so lax with respect to the authority of the Vedas as a revelation to reject the doctriue of their infallibility.

চরিতাখ্যায়ক আর এক স্থলে বলিয়াছেন শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সময় স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা ঈশ্বরারাধনার বিধি দেন এবং শ্রীধর ন্যায়রত্ন দ্বারা কাঁচড়াপাড়ার কোন এক বৈদ্য পরিবারে তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ করান। প্রকৃত কথা এই। একদা শ্রীধর ন্যায়রত্ন আনিয়া তাঁহাকে কহেন, কাঁচড়াপাড়ার কোন বৈদ্য পরিবারের কোন কোন স্ত্রীলোক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রণালী-ক্রমে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে অসমর্থ। তাঁহাদিগকে আমি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিতে বিধি দিয়াছি। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন যে অশিক্ষিত স্ত্রীদিগের পক্ষে নিরীশ্বর ও উপাসনা-শূন্য হইয়া থাকা অপেক্ষা হৃদয়ের ভক্তি-ভরে পুষ্প-চন্দনাদি দ্বারা ব্রহ্মের পূজা করাও বরং ভাল। প্রকৃত কথা এই মাত্র। চরিতাখ্যায়ক বুঝিবেন ইহাতে ব্রাহ্মসমাজে ফুল চন্দন ও নৈবেদ্যের ছড়াছড়ি করার কোনও প্রসঙ্গ হয় নাই। অক্ষয় বাবু ইহার যে কি নিবারণ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

চরিতাখ্যায়ক আর এক স্থলে এই ভাবের একটী বলিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজের যা কিছু আধ্যাত্মিক সংস্কার সমস্তই কেবল অক্ষয় বাবুর বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে সাধিত হয়। প্রত্যুত্তরে ইচ্ছা না থাকিলেও কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা একটী কঠোর কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। অক্ষয় বাবুর যখন ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযোগ, তখন হইতেই তাঁহার ভাবে ও কার্য্যে তিনি ইংরাজীতে যাহাকে বলে সংশয়বাদী তাহাই ছিলেন। পুরাতন তত্ত্ববোধিনীর প্রতি পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখ, যতগুলি তাঁহার রচিত ব্রহ্মস্তোত্র আছে তাহাতে কেবল 'নবকিসলয়োদ্বেলিত' প্রভৃতি ললিত পদবিন্যাসের ঘটা পাইবে কিন্তু কুত্রাপি গভীর হৃদয়ের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ নাই। তিনি কখন ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাস করেন, কখন নাও করেন। কখন প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার করেন, কখন নাও করেন *। এইরূপ ভাব ও

* আমরা এই সম্বন্ধে দত্তজর জীবন চরিত হইতে একটী রহস্যপূর্ণ যুক্তি পাইলাম। তাহা এই—একদা অক্ষয় বাবু কোন স্থলে আহূত হইয়া প্রার্থনার আব-

সংশয়বাদ যখন তাঁহার নেতা, তখন তাঁহার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক সংস্কার স্বীকার করা বা মনে করা আমরা মহাপাপ বিবেচনা করি। তিনি যে ভাব লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা ধর্ম্মের ঘোর প্রতিপন্থী। তদ্দ্বারা ধর্ম্মসংস্কার কখনই হইতে পারে না। তাঁহার বিশ্বাস সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবু আমাদিগকে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

The Babu long ago abjured his belief in Brahmoism and turned an agnostic. This change in his opinion could be proved by passages in his work on Hindu sects—

He abjured Brahmoism long ago, but he was tenaciously fond of appropriating to himself the sole glory of having introduced certain reforms in the Somaj, the doctrines of which he latterly hated. This was rather inconsistent in that eminent man, the glory of our country.

উপসংহারে একটী কথা বলি। অক্ষয়কুমার দত্ত এক জন বিদ্বান্ বিচক্ষণ ও সুলেখক ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী দ্বারা বঙ্গদেশের যে প্রভূত উপকার হইয়াছে, ইহা কে না স্বীকার করিবে? তিনি যে বঙ্গভাষার সমধিক পুষ্টি সাধন করিয়া যান, ইহাও অপলাপ করিবার নয়। ফলত তিনি আমাদেরই অক্ষয় বাবু এবং এই আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযোগ হওয়াতে তাঁহার ভাবী উন্নতির বীজ সঞ্চিত হয়, এই সমস্ত কথা স্মরণ করিলে আমাদিগেরই বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহার দুরাশা কখনই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। তিনি যাহা নহেন, আপনাকে তাহাই বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। এই বুঝিয়া কর্ত্তব্যের প্রেরণায় দুঃখের সহিত তাঁহার জীবনীর বহুর মধ্যে কএকটী ভ্রম প্রদর্শন করিলাম। এক্ষণে অনুরোধ চরিতাখ্যায়ক যেন পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ সংশোধিত আকারে প্রচার করেন। ইহাতে ধর্ম্মের মর্য্যাদা ও সত্যেরই মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে।

শাক্ত বিষয়ে পৃষ্ট হইলে তিনি সমীকরণ (equation) মন্ত্রবলে এইরূপ প্রত্যুত্তর দেন—পরিশ্রম = শস্য। পরিশ্রম ও প্রার্থনা = শস্য। অতএব প্রার্থনার শক্তি = শূন্য।

বালকের প্রার্থনা।

দয়াময়। আমাদের এত ক্ষুদ্রত্বেও তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর না। আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার আদেশ লঙ্ঘন করি তথাপি তুমি আমাদিগকে তোমার স্নেহময় অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান দান কর—তোমার পবিত্র সিংহাসনের নিকটে পাতকীকে দাঁড়াইতে দাও। আমাদের লজ্জা নাই—মহত্ত্ব নাই—মনুষ্যত্ব নাই, তাই আমরা তখনও ক্ষুদ্রত্ব পরিত্যাগ করিতে পারি না—স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া সত্যকে প্রাণের সঙ্গে আলিঙ্গন করিতে পারি না। নীচতা ক্ষুদ্রাশয়তা তখনও আমাদের হাড়ে হাড়ে মিশিয়া থাকে। তোমার কৃপা ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই—আমাদের হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা স্বার্থপরতা বিনাশ করিয়া তোমার সহবাসের উপযুক্ত কর।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক সোমবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়স্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পর ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীশ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তক।

পুস্তক	মূল্য
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩৷৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (ঐ ভাল বাঁধা)	২৷৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে)	২
ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্পূর্ণ (সুলভ মূল্য নব প্রকাশিত)	৷৷৹
ঐ ঐ (বাঁধা)	৸৹
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	৷৹
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	৷৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	৷৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত	৷৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	৷৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	৷৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ	৷৹
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ	৷৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (ভাল কাগজ ও ভাল বাঁধা)	৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸৹
ঐ ঐ (বাঁধা)	১
ঐ ঐ (ভাল বাঁধা)	১৶৹
দশোপদেশ	৷৷৶৹
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	৷৷৹
মাঘোৎসব	১
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৷৶৹
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৵৹
ভগবদ্গীতাসংগ্রহ	৷৹
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৷৶৹
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	৷৷৹
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	⁄৹
ব্রহ্মোপাসনা	⁄৹
ধর্ম্মশিক্ষা	৶৹
[illegible]ত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৶৹
[illegible]বচন সংগ্রহ	⁄১০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ ভাল বাঁধা (৬ষ্ঠ ভাগ পর্য্যন্ত)	৷৷৹
ঐ ঐ (৭ম ঐ)	৸৹
ব্রহ্মসঙ্গীত চতুর্থ ভাগ	৶৹
ব্রহ্ম-সঙ্গীত পঞ্চম ভাগ	৶৹
দুর্গোৎসব	⁄৹
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	⁄৹
রামমোহন রায়	৶৹

	Rs	As.	P.
A Discourse against Hero-making in religion	,,	12	,,
Hindoo Theism	,,	1	,,
Theist's Prayer Book	,,	1	,,
Signs of the Times	,,	1	,,
Doctrines of Christian Resurrection	,,	2	,,
Physiology of Idolatry	,,	2	,,
Tuhfatal Mawhhiddin	,,	4	,,

পুস্তক	মূল্য
ঋগ্বেদীয় "ঐতরেয়োপনিষৎ"	৷৶৹
সামবেদীয় "কেনোপনিষৎ" ও শুক্লযজুর্ব্বেদীয় "ঈশোপনিষৎ"	৷৶৹
শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয় "মুক্তিকোপনিষৎ"	⁄৹
কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় "শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ"	১৷৹
,, ,, "তৈত্তিরীয়োপনিষৎ"	১৷৶৹
,, ,, "কঠোপনিষৎ"	১
"তেজোবিন্দু ধ্যানবিন্দু অমৃতবিন্দু-উপনিষৎ"	৷৷৶৹
অথর্ব্ববেদীয় "অথর্ব্ব শির ও শিখা উপনিষৎ"	৷৷৶৹
,, ,, "প্রশ্নোপনিষৎ" ...	৸৹
,, ,, "মুণ্ডকোপনিষৎ" ...	৷৷৵৹
গৌড়পাদীয়কারিকার অনুবাদ সহিত অথর্ব্ববেদীয় "মাণ্ডুক্যোপনিষৎ" ...	১৷৷৶৹
পঞ্চদশী ...	৭৷৷৹
প্রবচনভাষ্য-সহিত 'সাংখ্যদর্শন,' ...	৪
পাতঞ্জল দর্শন শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত	১৷৷৶৹
সাংখ্যসার ,, ...	১৷৶৹
"শাণ্ডিল্য-সূত্র" (ভক্তিমীমাংসাগ্রন্থ)	১
বেদান্ত রত্নাবলী ১ম কল্প "সিদ্ধান্তবিন্দুসার," শঙ্করাচার্য্যের 'নিরঞ্জনাষ্টক' ভাষ্য সহিত 'হস্তামলক' সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী টীকা সহিত বেদান্তসার	১৷৷৶৹
বেদান্তরত্নাবলী ২য় কল্প ...	১
বেদান্তরত্নাবলী ৩য় কল্প ...	২৷৹
তত্ত্ববিদ্যা	১৷৷৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা (নব প্রকাশিত) ...	১
ঐ ঐ (ভাল বাঁধা) ...	১৷৹

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব।

অদ্যকার উৎসব আমাদের অন্তঃকরণে এই সত্যটি মুদ্রিত করিয়া দিতেছে যে, ঈশ্বরোপাসনাই মনুষ্য জীবনের সার উদ্দেশ্য। কিন্তু যে-কোন উদ্দেশ্য হউক্ না কেন তাহা সাধন করিতে গেলেই কতকগুলি আয়োজনের প্রয়োজন হয়। সাংসারিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা উপভোগ করিতে হইলে গৃহ এবং আর আর উপকরণের আয়োজন আবশ্যক। ঈশ্বরোপাসনা নির্ব্বিঘ্নে সাধন করিতে হইলে, আনুষঙ্গিক নানাবিধ আয়োজনের প্রয়োজন হয়; ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম তিনেরই প্রয়োজন হয়, কিন্তু অর্থ এবং কাম ধর্ম্মের অনুগত হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। অর্থ-কষ্ট দ্বারা যদি আমাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত থাকে, ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বারা যদি আমাদের মন অস্থির থাকে, তবে তাহা ঈশ্বরোপাসনার পক্ষে বড়ই বাধাজনক; কিন্তু অধর্ম্ম-দ্বারা যদি আত্মা কলুষিত থাকে তবে তাহা আরো ভয়ানক; আমরা বিপদে পড়িলে ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারি, কিন্তু পাপাচরণ করিলে আমাদের সে পথও বন্ধ হইয়া যায়। আমরা যদি অন্যের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করি, তবে কোন্ লজ্জায় আমরা ঈশ্বরের করুণার প্রার্থী হইব, আমরা যদি অপবিত্র বিষয়ে নিমগ্ন থাকি তবে কিরূপে আমরা পরমাত্মার পরম পবিত্র প্রেম-দৃষ্টির অনুপম জ্যোতি সহ্য করিব? অতএব ঈশ্বরোপাসনা নির্ব্বিঘ্নে সাধন করিতে হইলে ধর্ম্মের আয়োজন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয়; দরিদ্র ব্যক্তি অর্থকষ্টে বিভ্রান্ত হইয়াও ঈশ্বরকে ডাকিতে পারে, তৃষার্ত্ত পথিক মরুভূমির মধ্যে পড়িয়াও ঈশ্বরকে ডাকিতে পারে; কিন্তু পাপী ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রেম-মুখ "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহা ভয়ানক দেখে; পাপী ব্যক্তি বিশুদ্ধ প্রেমের দিকে তাকাইতে পারে না। অতএব ঈশ্বরোপাসনার অধিকারী হইতে হইলে অনুতপ্ত চিত্তে পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়া এবং আগ্রহ সহকারে ধর্ম্মের আয়োজন করা নিতান্ত পক্ষেই আবশ্যক। নিতান্ত বিষয়ী লোকেরা একদিকে ভোগেচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য অর্থ উপার্জ্জন করেন, আর এক দিকে অর্থোপার্জ্জনের সামর্থ্য-লাভ করিবার জন্য যথো-

পযুক্ত ভোগ-দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা করেন; এই প্রকারে তাঁহারা কামোদ্দেশী অর্থ এবং অর্থোদ্দেশী কাম এইরূপ এক ঘূর্ণাচক্রে নিয়ন্ত্রিত হইয়া অষ্ট প্রহর ঘুরিতে থাকেন। আবার, অনেক ধনমত্ত ব্যক্তি ভোগেচ্ছার চরিতার্থতাকে জীবনের একমাত্র সার জানিয়া সমস্ত ধন ঐশ্বর্য্য ভোগেচ্ছার অনির্ব্বাপ্য জঠরানলে ভস্মীভূত করিতে থাকেন; ইহাঁদিগের প্রতি ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এই যে,

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি;
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।"

কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার কখন নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত ঘৃত-প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় আরো বৃদ্ধিই হইতে থাকে।" সুদুষ্পূর ভোগের সাগরে যখন অর্থের স্রোত অধোগতি প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন তাহা অতি ভয়ানক অধোগতি। অর্থ হইতে কামে এবং কাম হইতে অর্থে ঘুরিয়া বেড়ানো অধোগতিও নহে, উর্দ্ধগতিও নহে, তাহা ঘূর্ণাগতি; কিন্তু কামের দিকে অর্থের একটানা স্রোত প্রকৃত পক্ষেই অধোগতি। ঘূর্ণা-গতির অর্থের দিক্ অপেক্ষা ভোগের দিক্ সমধিক প্রবল হইলেই তাহা অধোগতিতে পরিণত হয়; আর, তাহা ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইলেই উর্দ্ধগতিতে পরিণত হয়। ধর্ম্মই কেবল অর্থ এবং কাম উভয়েরই গতি উর্দ্ধদিকে—ঈশ্বরের দিকে—ফিরাইয়া দেয়। ঈশ্বর-প্রীতিই ধার্ম্মিক ব্যক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য এবং তাঁহার ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম তিনই সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়। ঈশ্বরোপাসনাই ধার্ম্মিক ব্যক্তির জীবন; ঈশ্বর-প্রীতি সে জীবনের অন্তরঙ্গ এবং ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন সে জীবনের বহিরঙ্গ। তেমনি আবার, ধর্ম্মই সেই প্রিয়কার্য্য সাধনের অন্তরঙ্গ; অর্থ এবং কাম তাহার বহিরঙ্গ। ধার্ম্মিক ব্যক্তি ন্যায় পূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন করেন, অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত হ'ন না; বৈধরূপে ভোগেচ্ছা চরিতার্থ করেন, অপবিত্র কার্য্যে লিপ্ত হ'ন না; সাধ্যানুসারে লোকের হিতসাধন করেন, কাহারো প্রতি অহিতাচরণ করেন না; এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি আপনার আত্মাতে ঈশ্বরের প্রেমমুখ-চ্ছবি দিন দিন স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর-রূপে দেখিতে পা'ন; তাঁহার অনুরাগ দিন দিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতররূপে ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হয়; ক্রমে তিনি সমস্ত পাপতাপ হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সহিত কামনার সমুদায় ফল উপভোগ করেন।

ধর্ম্ম যে, অর্থ এবং কামের একেবারেই বিরোধী তাহা নহে। ঈশ্বরোপাসনাই ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য; এজন্য যাহা ঈশ্বরোপাসনার পক্ষে বাধা-জনক, তাহা কখনই ধর্ম্মের উপদেশ হইতে পারে না। ধর্ম্ম কখনই এমন কথা বলে না যে, অর্থোপার্জ্জনে যত্ন করিও না; কেননা দারিদ্রের অশান্তিতে মনুষ্যের মন ঈশ্বরোপাসনার অনুপযোগী হইয়া পড়ে। ধর্ম্ম এমনও কথা বলে না যে, স্বাদু অন্ন ভোজন করিও না; কেননা অরুচি পূর্ব্বক বিস্বাদু অন্ন ভোজন করিলে শরীর মন সুস্থ থাকে না, ইহাতেও ঈশ্বরোপাসনার ব্যাঘাত জন্মে। ধর্ম্ম কেবল এই বলে যে, অন্যায় পূর্ব্বক অর্থ উপার্জন করিও না; অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভোজন করিও না; কেননা তাহা হইলে মনো-দর্পণে মালিন্যের সঞ্চার হইবে, ও আত্মাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব ঢাকা পড়িয়া যাইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এমনও কথা বলেন যে

"আমৃত্যোঃশ্রিয়মন্বিচ্ছেৎ নৈনাং মন্যেত দুর্ল্লভাং।"

"আমরণ ধন-সম্পত্তির চেষ্টা করিবেক, তাহা দুর্লভ মনে করিবেক না।" কিন্তু এই যে, আমরণ ধনসম্পত্তির চেষ্টা, ইহা কিসের জন্য? শুদ্ধ কি কেবল ভোগেচ্ছা চরিতার্থ

করিবার জন্য? না; ঈশ্বরোপাসনার বাধা অপহরণ এবং সাহায্য সাধনের জন্য। যে সমাজে সঙ্গতিপন্ন সাধু সজ্জন, ও সুস্থ-শরীর প্রসন্নচিত্ত নরনারীর সংখ্যা যত অধিক সেই সমাজ ঈশ্বরোপাসনার তত উপযুক্ত ক্ষেত্র। যে সমাজের অর্থ এবং কাম ধর্ম্মের অনুগত, তাহারই নাম আর্য্য সমাজ; আর্য্য সমাজই ঈশ্বরোপাসনার উপযুক্ত ক্ষেত্র। আর, যে সমাজে অর্থ এবং কাম ধর্ম্মের বিরোধী, তাহারই নাম অনার্য্য সমাজ বা আসুরিক সমাজ; ঈশ্বরোপাসনা আসুরিক সমাজের চক্ষের বিষ। আমাদের দেশের পূর্ব্বতন সমাজের সহিত অধুনাতন সমাজের তুলনা করিয়া দেখিলে আমরা এই বলিয়া আক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারি না যে, তখনকার সমাজ আর্য্য সমাজ, এখনকার সমাজ আসুরিক সমাজ। আমাদের দেশে পূর্ব্বতন কালে সকলেই আপন আপন ধর্ম্মে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিত; ধর্ম্মই তখন জীবনের মুখ্য কার্য্য ছিল; আর অর্থ অবলীলা-ক্রমে ধর্ম্মের অনুগামী হইত; "অর্থ" "অর্থ" করিয়া লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত না। ব্রাহ্মণেরা হা অন্ন যো অন্ন করিয়া কর্ম্মের ধন্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন না, তাঁহারা অধ্যয়ন অধ্যাপন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্বধর্ম্ম পালন করিতেন, তাহাতেই স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। ক্ষত্রিয়েরা রাজ্যের শাসন ও পালন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্বধর্ম্ম পালন করিতেন, তাহাতেই তাঁহারা অনায়াসে সংসার নির্ব্বাহ করিতেন। বৈশ্যেরা কৃষি বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্বধর্ম্ম পালন করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন হইত; এবং তাঁহাদের অর্থের কিয়দংশ ব্রাহ্মণ-সদনে, কিয়দংশ রাজ-সদনে গমন করিয়া, সরস্বতী এবং লক্ষ্মী উভয়েরই সেবায় নিযুক্ত হইত। শূদ্র, প্রভুর আশ্রয়ে স্বধর্ম্ম পালন করিয়া, নিরাপদে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। অধ্যয়ন-অধ্যাপন ব্রাহ্মণদিগের শুধু যে, কর্ম্ম ছিল, তাহা নহে, তাহা তাঁহাদের ধর্ম্ম ছিল; তেমনি, রাজ্য-রক্ষা ক্ষত্রিয়ের, কৃষি বাণিজ্য বৈশ্যের, প্রভুসেবা শূদ্রের ধর্ম্ম ছিল। তখন ধর্ম্ম-কার্য্য বলিয়া সেবাকার্য্যেরও মাহাত্ম্য ছিল। তখন, প্রতিজনকেই অর্থের ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত না; সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মপালনে সমস্ত অন্তঃকরণ—সমস্ত জীবন—সমর্পণ করিতেন; অর্থ এবং উপজীবিকা সমাজের নিয়মানুসারেই তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইত। ধর্ম্মই পূর্ব্বতন সমাজের ভিত্তি ভূমি ছিল, এজন্য তখন ঈশ্বরোপাসনা নির্ব্বিঘ্নে চলিত। এখনকার সমাজে যে ব্যক্তি যে-কার্য্যের কোন অংশেই উপযোগী নহে, সে ব্যক্তিকেও সেই কার্য্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন না করিলে চলে না—কেমন করিয়া সে ব্যক্তি সুস্থ চিত্তে ধর্ম্ম-সাধনে যত্ন নিয়োগ করিবে—ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ করিবে?

আম্রবৃক্ষকে দিয়া যদি বলপূর্ব্বক বিল্বফল উৎপাদন করানো যায়, তবে কি তাহা হইতে ভাল ফলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? কিন্তু যাহা চলিয়া গিয়াছে তাহার জন্য শোচনা করা বৃথা। উত্থান হইতে পতন এবং পতন হইতে উত্থান জগতে চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান পতন যে, ভবিষ্যৎ উত্থানের সোপান নহে, ইহা কেহই বলিতে অধিকারী নহে। আমরা যখন নিদ্রিত থাকি, ঈশ্বর তখন নিদ্রিত থাকেন না—তাই চতুর্দ্দিকস্থিত বিশাল মরুভূমির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ সরস উদ্যান গাত্র উত্তোলন করিয়াছে। ঈশ্বর আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমরা যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল

হইবে; তাহা হইলেই তিনি আমাদের কাণ্ডারী হইয়া আমাদিগকে দুঃখ শোকের পরপারে লইয়া যাইবেন; তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারত সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে—তখন সমস্ত ভারত সমাজ একাত্মা হইয়া ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিয়া দেশের সমস্ত দিগ্বিদিক্ কল্যাণে পরিপ্লাবিত করিবে। ঈশ্বর করুন সেই শুভ দিনের সূর্য্য-কিরণ প্রাতঃকালের শিশির বিন্দুর ন্যায় আমাদের নয়নের অশ্রুরাশি অচিরে অপহরণ করুক্।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব।

সিদ্ধান্ত ॥ ১ ॥

জ্ঞানের মূল নিয়ম।

যে-কোন জ্ঞাতা যাহা-কিছু জানে, তাহারই সঙ্গে, তাহার সেই জ্ঞানের ভিত্তি-মূল-স্বরূপে আপনাকে কিছু-না-কিছু জানা তাহার নিতান্ত আবশ্যক।

মন্তব্য এবং ব্যাখ্যান।

এই প্রথম সিদ্ধান্ত তত্ত্বজ্ঞানের মূল প্রশ্নের প্রত্যুত্তর ॥১॥

আপনি অথবা আমি—এইটিই সেই সাধারণ মধ্য-ভূমি, সেই নিরন্তর-পরিজ্ঞাত সম্মিলন-স্থান, যেখানে আমাদের সমস্ত জ্ঞান মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া অবস্থিতি করে। যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয়ের মধ্যে আত্মাই কেবল একমাত্র নিরন্তর-জ্ঞেয়। আপনাকে জানা ব্যতিরেকে তোমারই হউক্—আমারই হউক্—আর যাহারই হউক—কাহারো জ্ঞানের অস্তিত্বই সম্ভবে না। উপক্রমণিকায় তত্ত্বজ্ঞানের মূল প্রশ্ন যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে—এই প্রথম সিদ্ধান্তটি তাহার সুস্পষ্ট প্রত্যুত্তর;—এমন একটি অদ্বিতীয় অবয়ব কি আছে, যাহা আমাদের সকল জ্ঞানেই বিদ্যমান,—এমন একটি সাধারণ সন্ধিস্থল কি, যেখানে আমাদের সমস্ত জ্ঞান ঘনীভূত এবং একীভূত হইয়া অবস্থিতি করে,—এমন একটি মূল ধাতু কি, যাহা সকল জ্ঞানের পক্ষেই সমান আবশ্যক, অর্থাৎ যাহাতে জ্ঞানের জ্ঞানত্ব হয়? আত্মাই সেই অদ্বিতীয় অবয়ব, সেই সাধারণ সন্ধিস্থল, সেই মূল ধাতু; আত্মা এমনি একটি সাধারণ মধ্যস্থল যে, আর আর স্থলে জ্ঞানে জ্ঞানে যতই কেন প্রভেদ থাকুক্ না, সেখানে কিন্তু প্রভেদের লেশ মাত্রও দৃষ্ট হয় না; সেখানে সকল জ্ঞানের মধ্যে কেবল ঐক্যই প্রতিভাত হয়;* আর, যিনিই একটু ভাবিয়া

---

* জ্ঞান যে অংশে শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় সকলেতে তন্ময়ীভূত, সে অংশে এক জ্ঞান আর-এক জ্ঞান হইতে ভিন্ন (যেমন, শব্দ-জ্ঞান স্পর্শ-জ্ঞান হইতে ভিন্ন), সুতরাং সে অংশে জ্ঞান আত্মা-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না,—শব্দ-জ্ঞানও আত্মা নহে, স্পর্শ জ্ঞানও আত্মা নহে; যে অংশে জ্ঞানে জ্ঞানে প্রভেদ নাই সেই অংশেই জ্ঞান আত্মা শব্দের বাচ্য। যে জ্ঞান শব্দ-বিষয়ক সে জ্ঞান স্পর্শ-বিষয়ক নহে; কাজেই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ স্বীকার করিতে হইতেছে। কিন্তু যে জ্ঞান শব্দের সাক্ষী সেই জ্ঞানই স্পর্শের সাক্ষী, সুতরাং শব্দের সাক্ষী জ্ঞান এবং স্পর্শের সাক্ষী জ্ঞান—এ দুই জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ নাই। যে স্থলে, এইরূপ, জ্ঞানে জ্ঞানে প্রভেদ নাই, সেইস্থলেই জ্ঞান আত্মা শব্দের বাচ্য; বাহ্য জ্ঞান আত্মা শব্দের বাচ্য নহে, সাক্ষী জ্ঞানই আত্মা শব্দের বাচ্য। স্কট্লাণ্ডীয় তত্ত্ববিৎ হামিল্টন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে Consciousnessই, অর্থাৎ সাক্ষী জ্ঞানই, আত্মা। পঞ্চদশী প্রণেতাও অতীব স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, সম্বিৎই আত্মা, সম্বিৎ কিনা Consciousness সাক্ষী জ্ঞান; যথা;

শব্দ-স্পর্শাদয়ো বেদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্।
ততো বিভক্তা তৎসম্বিৎ ঐকরূপ্যান্ন ভিদ্যতে ॥
তথা স্বপ্নেঽত্র বেদ্যন্তু ন স্থিরং জাগরে স্থিরং।
তদ্ভেদোঽতস্তয়োঃ সম্বিদ্ একরূপা ন ভিদ্যতে ॥
সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ততমোবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ।
সা চাববুদ্ধ-বিষয়াঽববুদ্ধং তত্তদা তমঃ ॥
স বোধো বিষয়াদ্ভিন্নো ন বোধাৎ স্বপ্নবোধবৎ।
এবং স্থানত্রয়েঽপ্যেকা সম্বিৎ তদ্বদ্দিনান্তরে ॥
মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ম্প্রভা ॥
ইয়ং আত্মা * * *

দেখিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে, আত্মার ন্যায় দ্বিতীয় এমন-আর-একটি অবিচলিত লক্ষ্যস্থান নাই। তিনি দেখিবেন যে, আপনা-ভিন্ন আর কাহারো প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তিনি এরূপ কথা বলিতে পারেন না যে, "আমি যাহাই কেন জানি না—তাহারই সঙ্গে—এ বস্তুটিকে আমার না জানিলেই নয়।"

জ্ঞানের যে নিয়মটি সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং অলঙ্ঘনীয় তাহাই এই প্রথম সিদ্ধান্তে বিন্যস্ত হইল ॥২॥

জ্ঞানের মূলগত যত কিছু ব্যাপার, তাহার মধ্যে, আপনা-দ্বারা আপনাকে জানা সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং অলঙ্ঘনীয়; কারণ, "যাহা-হয়-একটা-কিছু জানিতে হইলেই তাহার সঙ্গে আপনাকে জানা চাই" এই যে, একটি নিয়ম, ইহাকে লঙ্ঘন করিয়া কোন জ্ঞান-ক্রিয়াই চলিতে পারে না; আর, যেখানে ঐ নিয়মটিকে মানিয়া চলা হয়, সেখানে কোন-না-কোন-প্রকার জ্ঞান-ক্রিয়া অনিবার্য্য। বর্ত্তমান খণ্ডের (জ্ঞান-তত্ত্বের) চরম সিদ্ধান্ত-টি ছাড়া—দ্বিতীয় অবধি করিয়া পর-পর-বর্ত্তী আর যত-গুলি সিদ্ধান্ত আছে, তাহাদের প্রত্যেকে একটি-না-একটি অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বের পরিচায়ক। কিন্তু সে সব তত্ত্বের অবশ্যম্ভাবিতার মূল যাহা, তাহা এই প্রথম সিদ্ধান্তে বিনিবেশিত হইল। এই প্রথম সিদ্ধান্তে জ্ঞানের মূল নিয়ম প্রকাশিত হইল; জ্ঞানের আর যত-সব অবশ্যম্ভাবী নিয়ম সমস্তই উহার শাখা প্রশাখা।

প্রথম সিদ্ধান্ত বলে এই যে, মনের সজ্ঞান অবস্থায় আত্মজ্ঞান ক্ষণমাত্রও স্থগিত থাকে না ॥৩॥

আত্মজ্ঞান এরূপ ক্ষণিক ব্যাপার নহে যে, তাহা যখনকার কার্য্য তখনই করিয়া চুকিয়া—তাহাকে হস্ত হইতে অবসর দিয়া অন্যান্য জ্ঞানে হস্তার্পণ করা যাইতে পারে। আমরা যখন মনে করি যে, আমাদের মন বাহ্য বিষয়েতেই সর্ব্বাংশে নিমগ্ন, তখন আমাদের আত্মজ্ঞান একেবারেই যে স্থগিত থাকে—তাহাও নহে। আত্মজ্ঞান আমাদের সমস্ত জ্ঞানেরই সঙ্গে সঙ্গে লাগিয়া থাকে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার বিরাম নাই। আমরা যখন যে-কোন জ্ঞানে উপনীত হই,—আত্মজ্ঞানের মধ্য দিয়াই—আত্মজ্ঞানের সঙ্গ ধরিয়াই—আমরা তাহাতে উপনীত হই।

তবে কেন আত্মজ্ঞান কখন কখন একেবারেই নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত বলিয়া মনে হয় ॥৪॥

এখানে এই এক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, যখন আমরা কাজ-কর্ম্মে বিব্রত থাকি, অথবা বিষয়-চিন্তায় নিমগ্ন থাকি, তখন অনেক সময় এমন ঘটে যে, ঘণ্টা-কে-ঘণ্টা—এমন কি দিন-কে-দিন—পার হইয়া যাইতেছে, অথচ আমাদের এমন অবকাশ হইতেছে না যে, এক মুহূর্ত্তকাল

ইহার অর্থ।

জাগ্রৎকালে শব্দস্পর্শাদি বিষয়-সকল বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত সুতরাং তাহারা পরস্পর হইতে বিভিন্ন, কিন্তু সেই সকল বিভিন্ন বিষয়ের যে, সম্বিৎ (অর্থাৎ সাক্ষীরূপী জ্ঞান), তাহা একই লক্ষণাক্রান্ত সুতরাং অভিন্ন। স্বপ্নকালেও এইরূপ; স্বপ্নকালের জ্ঞেয় বিষয় সকল অস্থির, জাগ্রৎকালের জ্ঞেয় বিষয়-সকল স্থির, বিষয়েতে বিষয়েতে এইরূপ প্রভেদ; কিন্তু যে জ্ঞান স্বপ্ন-কালের সাক্ষী, সেই জ্ঞানই জাগ্রৎ কালের সাক্ষী; অতএব দুই বিভিন্ন কালের সাক্ষী যে, জ্ঞান, তাহা দুই নহে—তাহা একই অভিন্ন। সুষুপ্তি-কালেও তাই; সুষুপ্তি-কালের অন্ধকার-বোধ সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্মৃতি-পথে উপনীত হয়; স্মৃতি মাত্রই পূর্ব্বকালীন সাক্ষাৎ জ্ঞানকে অপেক্ষা করে; অতএব সুষুপ্তির অন্ধকার সুষুপ্তি-কালে সাক্ষাৎ জ্ঞানে বিদ্যমান থাকে, তাই তাহা নিদ্রাভঙ্গের সময় স্মরণে আবির্ভূত হয়। যে জ্ঞান জাগ্রৎকালের সাক্ষী, সেই জ্ঞানই স্বপ্ন-কালের সাক্ষী, সেই জ্ঞানই সুষুপ্তিকালের সাক্ষী। বিষয়েতে বিষয়েতে প্রভেদ, বিষয়েতে জ্ঞানেতে প্রভেদ, কিন্তু সাক্ষীরূপী জ্ঞানেতে জ্ঞানেতে প্রভেদ নাই। এক দিনের অহোরাত্রি-ভেদে যেমন সাক্ষীজ্ঞানের ভিন্নতা হয় না, দিন-ভেদেও সেইরূপ। মাস অব্দ যুগ কল্প বহুধা গতায়াত করিতেছে—স্বয়ম্প্রকাশ সাক্ষীজ্ঞানই এক যা কেবল উদয়ও হয় না—অস্তও হয় না। এই সাক্ষী জ্ঞানই আত্মা।

আপনার প্রতি মনো-নিবেশ করি। এ আপত্তি-টি প্রথম সিদ্ধান্তের প্রাণে আঘাত করিতে উদ্যত,—ইহার পরিহারের উপায় কি?

আপত্তির পরিহার ॥৫॥

প্রথম সিদ্ধান্ত যদি এরূপ বলিত যে, আমাদের আপনার আপনার প্রতি আমাদের মন সর্ব্বক্ষণই সুস্পষ্ট রূপে এবং বলবৎরূপে নিবিষ্ট থাকে, অথবা, আমরা আপনারা সর্ব্বক্ষণই আমাদের মুখ্য প্রণিধানের বিষয়, তবে ঐ আপত্তি-টি প্রথম সিদ্ধান্তের পক্ষে নিতান্তই মারাত্মক হইত। তাহা হইলে পরীক্ষাকে সাক্ষী মান্য করিলেই, প্রথম সিদ্ধান্ত-টি একেবারেই প্রমাণ-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ পাইত; কারণ, প্রায়শই এইরূপ ঘটে যে, আপনাদিগকে আমরা অতি অল্পই গ্রাহ্য করি। কিন্তু অল্প গ্রাহ্য করা স্বতন্ত্র, আর, একেবারেই অগ্রাহ্য করা স্বতন্ত্র। বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত কেবল এই মাত্র বলে যে, যে কোন জ্ঞাতা হউক্ না—কোন জ্ঞাতাই ক্ষণমাত্রও নিতান্ত আত্ম-জ্ঞান-বর্জ্জিত—নিতান্ত আত্ম-বিস্মৃত—হইতে পারে না; যখন তাহার মন বাহ্য বিষয়ে আত্যন্তিক নিমগ্ন—তখনও নহে। আত্ম-বিস্মৃতির মাত্রা যত উচ্চেই চড়ানো হউক্ না—তাহা আংশিক এবং কৃত্রিম বই আর কিছুই হইতে পারে না, তাহা ঐকান্তিক হইতে পারে না—বাস্তবিক হইতে পারে না। যাহার যে প্রত্যক্ষ ক্রিয়া, যাহার যে ভাবনা, তাহা তাহার আপনারই প্রত্যক্ষ ক্রিয়া—আপনারই ভাবনা; সুতরাং প্রত্যক্ষ মাত্রেতেই—ভাবনা-মাত্রেতেই—আত্মাপেক্ষা নিগূঢ়-রূপে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, যখন আমরা বাহ্য বিষয়েতে প্রগাঢ় রূপে নিমগ্ন থাকি তখনও আমরা আত্ম-জ্ঞান হইতে একেবারেই বিনাকৃত হই না। বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নিরস্ত এবং ইহার জন্য সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত। আমাদের জাগ্রৎকালের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে—আমাদের সমস্ত জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে—আত্মজ্ঞানের একটি প্রশান্ত-বাহী নির্ব্বিবাদী স্রোত বহিয়া চলিতেছে, এবং সেই আত্মজ্ঞানই আমাদের আর আর সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তি-ভূমি।* আমাদের হস্ত-স্থিত কোন বস্তুর বা কার্য্যের প্রতি আমাদের মনের পোনেরো আনা উনিশ গণ্ডা তিন কড়া অংশ নিবিষ্ট থাকে থাকুক্—আমাদের মনের এক কড়া বা আরো অল্পাংশ তো আমাদের আপনাদের প্রতি নিবিষ্ট থাকে? তাহা হইলেই হইল; আমাদের পক্ষ-সমর্থনের জন্য ঐ টুকুই যথেষ্ট—আর কিছুই আমরা চাই না।

ঘনিষ্ট সহবাস আত্মোপেক্ষার কারণ ॥৬॥

এই তো আমরা দেখিলাম যে, আমাদের সজ্ঞান অবস্থায় আমরা আপনারা কোনকালেই আমাদের আপনাদের জ্ঞান হইতে সরিয়া পড়ি না; তবে কেন আমাদের এরূপ মনে হয় যে, আমরা প্রায়শই আত্মবিস্মৃত? আপনাকে যে, আমরা দেখিয়াও দেখি না, তাহার কারণ আর কিছু না—মনুষ্য-প্রকৃতির নিয়মই এই যে, ঘনিষ্ট সহবাস অবহেলার প্রসূতি। যাহা আমরা সর্ব্বদা দেখি শুনি তাহা আমাদের গণনার মধ্যে আসে না; আর, যাহা কিছু আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহার নূতনত্বের তার-

---

* পঞ্চদশীর নিম্ন-লিখিত বচন-টি এই কথারই সহোদর;—

"অহংপ্রত্যয় বীজত্বমিদম্বৃত্তেরতি স্ফুটং। অবিদিত্বা স্বমাত্মানং বাহ্যম্বেদ নতু কচিৎ॥"

ইহার অর্থ

বাহ্য বিষয় সম্বন্ধীয় যত কিছু জ্ঞান—সমস্তই আত্ম-জ্ঞান-সাপেক্ষ। আপনাকে না জানিয়া কেহই বাহ্য-বিষয়কে জানিতে পারে না।

তম্য অনুসারেই তাহার প্রতি আমাদের মনোযোগের তারতম্য হয়। যাহার দর্শন দুর্লভ, তাহাতেই আমাদের মন আকৃষ্ট হয়; আর, যাহা আমরা অষ্টপ্রহরই দেখিতেছি, তাহার প্রতি আমাদের তাচ্ছিল্য জন্মে। যাহা নূতন তাহাই আমাদের চক্ষুকে চমকিত করে; যাহা আমাদের চির-পরিচিত তাহা আমাদের চক্ষে লাগে না। আষ্টপ্রহরিক ব্যবহারের ন্যায়—মনশ্চক্ষু ঘোলাইয়া দিতে—কৌতূহলের আগ্রহ মন্দাইয়া দিতে—এমন আর কেহই নাই। ইহার উদাহরণ যেখানে সেখানে পড়িয়া আছে। এখানে কেবল এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, যাঁহারই সম্মুখে যাহাই কেন উপস্থিত হউক্ না—তাহারই অপেক্ষা তিনি আপনার সহিত অধিক পরিচিত, তাই তাহারই অপেক্ষা তিনি আপনার প্রতি অল্প মনোযোগী। আমরা প্রতিজনেই আপনার নিকট নিরন্তর উপস্থিত—তাই আপনাকে দেখিয়াও দেখি না।* আমাদের জ্ঞানের মূল নিয়মকে আমরা এরূপ অবিচ্ছেদে মানিয়া চলি যে, আমরা তাহাকে লক্ষ্যই করি না। আমাদের মনের যেরূপ প্রচলিত ভাব গতি, তাহাতে আমরা আপনারা যেন আমাদের জ্ঞানের নিকট কেহই নহি। এটি, আপনার সহিত আপনার গলাগলি ঘনিষ্ঠতার—নিরবচ্ছিন্ন সহবাসের—চির পরিচয়ের—অনিবার্য্য ফল। যে সূত্রে মনুষ্য আপনার জ্ঞানে আপনি বাঁধা, তাহা যতই কেন সূক্ষ্ম হউক্ না, কোন কালেই তাহা ছিন্ন হইতে পারে না।

আত্মাবহেলার দ্বিতীয় কারণ ইন্দ্রিয়ের অগম্যতা ॥ ৭ ॥

এখানে আর একটি বিষয় বিবেচ্য; সে-টি এই যে, আমাদের জ্ঞানের অভ্যন্তরে দুইটি প্রদেশ দেখিতে পাওয়া যায়; একটি প্রদেশ উপস্থিত উপস্থিত ইন্দ্রিয়-গম্য বিষয়-সকলেতেই তন্ময়ীভূত, সুতরাং তাহা ইন্দ্রিয়-গম্য; আর একটি প্রদেশ কেবল বুদ্ধিরই গম্য—ইন্দ্রিয়ের অগম্য; যে প্রদেশটি অতীন্দ্রিয় তাহা অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গম্য প্রদেশটি সমধিক বল-সহকারে আমাদের মন আকর্ষণ করে। মনুষ্য আপনার শরীরকে দর্শন করিতে পারে, স্পর্শ করিতে পারে; কিন্তু আপনাকে দর্শন করিতেও পারে না, স্পর্শ করিতেও পারে না। শরীরের ন্যায় আত্মা ইন্দ্রিয়-গম্য নহে। আমাদের মন স্বভাবতই ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সমূহে বলবৎরূপে বাঁধা পড়িয়া যায়; এজন্য আমাদের সাংসারিক কর্ম্ম কার্য্যের সময়—মনের অষ্ট-প্রহর-সুলভ প্রাকৃত অবস্থায়—আমরা আপনার প্রতি অতি অল্পই মনোনিবেশ করিতে অবসর পাই। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, দুই কারণে আমরা আপনার প্রতি এত অল্প মনোযোগী;—এক কারণ এই যে, ঘনিষ্ঠতা অবহেলার প্রসূতি; আর এক কারণ এই যে, আত্মা ইন্দ্রিয়ের অগম্য।

প্রথম সিদ্ধান্তের বিরোধী একটি সিদ্ধান্তের খণ্ডন ॥ ৮ ॥

কোন কোন দর্শনকার'কে এখানকার এ সিদ্ধান্তের বিরোধী মত অবলম্বন করিতে দেখা যায়। ইহাঁরা বলেন এই যে, প্রথমে আমরা কেবল ইন্দ্রিয়-সংক্রান্ত উপরক্তিগুলিই (অর্থাৎ বহির্ব্বিষয়ের ছাপগুলিই)

---

* বেদান্ত দর্শনে "দশম পুরুষ ন্যায়" নামক আত্মবিস্মৃতির একটি উদাহরণ প্রসিদ্ধ আছে, সেটি এই;—দশজন ব্যক্তি এক সঙ্গে নৌকারোহণ পূর্ব্বক নদী পার হইয়া আপনাদের সংখ্যা নির্ণয় করিতে লাগিলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য—যিনিই গণনা করেন তিনিই আপনাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতর নয় জনকে গণনা করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন, ও "আর এক জন কোথায়" বলিয়া বিভ্রান্ত হ'ন; এটি কাহারো মনে হইতেছে না যে, তিনি আপনিই দশম ব্যক্তি। পঞ্চদশীতে আছে—

"নব সংখ্যা হৃতজ্ঞানো দশমো বিভ্রমাত্তদা।
ন বেত্তি দশমোঽস্মীতি বীক্ষ্যমানোঽপি তান্নব ॥"

দশম ব্যক্তি আপনি ছাড়া নয় জনকে দেখিয়াও নয় সংখ্যায় এরূপ বিভ্রান্ত হইতেছেন যে, ইহা তিনি দেখিতেছেন না যে, তিনি নিজেই দশম।

জ্ঞানে উপলব্ধি করি; তাহার পর, যতক্ষণ না পুনর্ব্বার সেই উপরক্তি-গুলিকে চিন্তা-ক্ষেত্রে আনয়ন করি, ততক্ষণ আমরা আপনাকে তাহাদের জ্ঞাতা বলিয়া উপলব্ধি করি না। ইহাঁরা আমাদিগকে এক প্রকার অসাধ্য সাধন করিতে বলেন;—যে সকল উপরক্তির উপস্থিতি-কালে আমরা তাহাদিগকে আপনার বলিয়া উপলব্ধি করি নাই, সেই-সকল উপরক্তির অনুপস্থিতি-কালে তাহাদিগকে আপনার বলিয়া স্মরণ করিতে বলেন। পূর্ব্বে যাহা সাক্ষাৎ-জ্ঞানে উপস্থিত হয় নাই, পশ্চাতে তাহা কেহই স্মরণ করিতে পারে না। যদি সেই উপরক্তি-গুলির উপস্থিতি-কালে তাহাদিগকে আমরা আপনার বলিয়া না জানিলাম, তবে পরে তাহাদিগকে কেমন করিয়া আপনার বলিয়া স্মরণ করিব? স্মরণ বলিতে এখানে আর তো কিছুই নয়—সেই উপরক্তিগুলির সহিত আমাদের সম্বন্ধ যাহা আমরা পূর্ব্বে উপলব্ধি করিয়াছি তাহারই স্মরণ; কিন্তু আপনাকে উপলব্ধি না করিয়া আপনার সহিত অন্য কোন-কিছুর সম্বন্ধ উপলব্ধি করা অসম্ভব; অতএব যদি পরে ভাবিয়া দেখিলে এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে, ঐ উপরক্তি-গুলি আমাদের আপনার আপনার সম্বন্ধেই ঘটিয়াছিল, তবে তাহাদের প্রথম উপস্থিতি-কালে অবশ্য তাহাদিগকে আমরা আপনার আপনার বলিয়াই উপলব্ধি করিয়াছিলাম। সাক্ষাৎ-জ্ঞান পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছে, স্মরণ তাহাই পুনরাবৃত্তি করিতে পারে; স্মরণ অজ্ঞাত-পূর্ব্ব নূতন কোন কথাই বলিতে পারে না। স্মরণের একটি কথাও দেখা কথা নহে, তাহার সকল কথাই শেখা কথা; আর, পূর্ব্ববর্ত্তী সাক্ষাৎ জ্ঞানই স্মরণের একমাত্র শিক্ষা গুরু। কথিত উপরক্তিগুলির প্রথম উপস্থিতির সময় আমরা নাকি আমাদের আপনা আপনাকে সেই উপরক্তিগুলির গৃহীতা বলিয়া উপলব্ধি করি, তাই তাহাদের স্মরণের সময় আমরা আপনা-আপনাকে তাহাদের গৃহীতা বলিয়া স্মরণ করি। তবেই হইতেছে যে, তাহাদের প্রথম উপস্থিতি-কালেও তাহাদিগকে আমরা আপনার বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলাম—সুতরাং তখন-হইতেই আমাদের আত্ম জ্ঞান কার্য্য করিয়া আসিতেছে।

সমস্ত তন্ত্রটির ভিত্তি-মূল বলিয়াই প্রথম সিদ্ধান্তের যত কিছু গুরুত্ব॥ ৯॥

প্রথম সিদ্ধান্তটিকে পর-পরবর্ত্তী আর আর সিদ্ধান্ত হইতে বিযুক্ত করিয়া শুদ্ধ যদি কেবল তাহার নিজের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করা যায়, তবে তাহা অতীব অকিঞ্চিৎকর হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু, তাহা সমস্ত তন্ত্রটির একমাত্র ভিত্তি-ভূমি—এবং পর-পরবর্ত্তী সমস্ত সিদ্ধান্তগুলির একমাত্র অবলম্বন—এই ভাবে যদি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তবে তাহার মাহাত্ম্যের কীর্ত্তন এবং তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যা একমুখে করিতে পারা যায় না। এই সিদ্ধান্তটি কতদূর অটল এবং সর্ব্ববাদী সম্মত—ইহারই উপর বর্ত্তমান সংহিতার সকলই নির্ভর করিতেছে। ইহার স্থৈর্য্যেই সমস্ত তন্ত্রটির স্থৈর্য্য, ইহার পতনেই সমস্ত তন্ত্রটির পতন। এ সিদ্ধান্তটির নিজের বিশেষ তেমন-কোন অর্থ-গৌরব না দেখিয়া জিজ্ঞাসু ব্যক্তি হয় তো মনে করিবেন যে, "এই বই না—তবে মিছে কেন আর পণ্ডশ্রম—এক আঁচড়েই বুঝিতে পারা গিয়াছে।" তিনি হয় তো মনে করিবেন যে, "আমার সমস্ত জ্ঞান এবং সমস্ত প্রত্যক্ষ-ক্রিয়া আমার নিজের" এই তো একরত্তি কথা, কিন্তু ইহার ঘটা ও আড়ম্বর দেখিলে মনে হয় যে, কি না জানি ব্যাপার!" জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে আমরা এই বলি যে, তিনি এগো'ন, পরে পরে কি আসিতেছে তাহা দেখুন, তাহার পর যাহা বলিবার হয়—

বলিবেন।* বর্ত্তমান সিদ্ধান্তটিকে কত যে গুরুভার বহন করিতে হইবে—তিনি তাহা দেখিতেছেন না—আমরা তাহা দেখিতেছি, এজন্য, ইহার পত্তন-ভূমি দৃঢ় করিবার জন্য আরো গুটি দুই কথা আমাদিগকে বলিতে হইতেছে—ইহাতে কেহ আমাদের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

এ সিদ্ধান্তটি পরীক্ষা-দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে না, পরীক্ষা-দ্বারা বরং আরো দৃঢ়ীকৃত হয় ॥১০॥

বর্ত্তমান সিদ্ধান্তটি পরীক্ষা দ্বারা সুস্পষ্ট-রূপে সমর্থিত হউক্ বা না হউক্—কিন্তু এটি স্থির যে, উহা পরীক্ষা-দ্বারা কোন মতেই খণ্ডন-সাধ্য নহে। কোন ব্যক্তি সহস্র চেষ্টা করিলেও আপনাকে আপনার জ্ঞান হইতে দূর করিয়া দিয়া অন্য কোন বস্তুকে জানিতে পারেন না। কোন মনুষ্যই সজ্ঞান-ভাবে আপনাকে একেবারেই গণনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আর আর বিষয়ের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। উল্টা আরো তিনি দেখিবেন যে, তিনি যে-কোন দৃশ্যাবলীর মধ্যদিয়াই পদ-নিক্ষেপ করুন, আর, যে-কোন কর্ম্ম-কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকুন, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে, তিনি আপনাকে আপনার জ্ঞানারূঢ় করিয়া লইয়া চলিতেছেন,—তিনি ইচ্ছা করিলেও তাহার অন্যথা করিতে পারেন না। তিনি দেখিবেন যে, তাঁহার যে-কোন প্রত্যক্ষ-ক্রিয়া হউক্ না কেন, যখনই তিনি তাহা জ্ঞানে উপলব্ধি করেন, তখনই তিনি তাহা আপনার বলিয়া উপলব্ধি করেন। এই-রূপ, আপনার জ্ঞান-ক্রিয়াকে আপনার বলিয়া জানা'র নামই আপনাকে জানা। অতএব পরীক্ষা প্রথম সিদ্ধান্তের বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক্, বরং তাহা আরো প্রথম সিদ্ধান্তের পোষকতা করিতেছে।

প্রজ্ঞা বা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানই প্রথম সিদ্ধান্তের মুখ্য প্রমাণ ॥১১॥

কিন্তু বর্ত্তমান সিদ্ধান্তটিকে পর-পর-বর্ত্তী সমস্ত সিদ্ধান্ত-গুলির ভিত্তিমূল-পদের উপযুক্ত হইতে হইলে, তাহার যেরূপ অপরিসীম নিশ্চয়তা এবং ব্যাপকতা আবশ্যক, তাহা একা-কেবল প্রজ্ঞাই তাহাকে দিতে পারে। পরীক্ষা কেবল বর্ত্তমান সিদ্ধান্তটিকে সঙ্কীর্ণ একটি বৃত্তান্ত করিয়া দাঁড় করাইতে পারে; কিন্তু শুধু তাহা হইলে এ সিদ্ধান্ত-টি পর-পর-বর্ত্তী সিদ্ধান্ত সকলের কোন উপকারে আসিতে পারে না। তাহা নহে,—বর্ত্তমান সিদ্ধান্তটিকে জ্ঞানের একটি অবশ্যম্ভাবী সত্য করিয়া দাঁড় করানো চাই—সকল জ্ঞানের উপরেই উহার সমান আধিপত্য সংস্থাপন করা চাই—উহাকে এরূপ করিয়া প্রতিপন্ন করা চাই যে, উহার বিপরীত পক্ষ একেবারেই স্ববিরোধী এবং অসঙ্গত। প্রকৃত কথা এই যে, বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত-টি প্রমাণের কোন অপেক্ষা রাখে না; উহা নিজেই সর্ব্বপ্রথম প্রমাণ-দ্বার, এজন্য আর কোন

* সকল বিজ্ঞানেরই আরম্ভ-সূত্র দেখিতে অতীব অকিঞ্চিৎকর। জ্যামিতির আরম্ভ-স্থানে আছে যে, যে-রেখা তাহার দুই প্রান্তের মধ্যে সম-ভাবে বিন্যস্ত তাহাই সরল রেখা। গতি-বিজ্ঞানের গোড়াতেই আছে যে, চলমান বস্তু কোন কিছু কর্ত্তৃক বাধা-প্রাপ্ত না হইলে, তাহা, যেমন চলিতেছে তেমনি চলিতে থাকিবে। রসায়ণ বিদ্যার একটি মূলতত্ত্ব এই যে, দুই বস্তুকে তৌল করিলে তাহাদের মোট গুরুত্ব যেরূপ দাঁড়ায়, তাহাদের সংযোগ-জাত বস্তুর গুরুত্ব তাহার ন্যূনাধিক হইতে পারে না। বিজ্ঞানের প্রবেশ দ্বারে এই সকল সামান্য সত্য দেখিয়া বিজ্ঞানের প্রতি যাঁহার অভক্তি জন্মে, তিনি বিজ্ঞানের নিতান্তই অনধিকারী। যিনি কোন সত্যকেই অকিঞ্চিৎকর মনে করেন না, তিনিই বিজ্ঞানের প্রকৃত অধিকারী। কেননা কি লঘু কি গুরু সকল সত্যই অকাট্য যোগ-সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। লঘু সত্যের ক্ষুদ্র দ্বারে মস্তক অবনত না করিয়া, গুরু সত্যের বিশাল মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারা যায় না। গোমুখী প্রদেশের গঙ্গা গঙ্গাই নহে, তাহা একটি ক্ষুদ্র নালা মাত্র; কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না যে, তাহাই গঙ্গার মূল প্রস্রবন।

দ্বার দিয়া উহাতে উপনীত হওয়া যায় না।*
তবে—এরূপ করিয়া উহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যে, তদ্দৃষ্টে উহার স্বতঃসিদ্ধতা-বিষয়ে কাহারো মনে তিল-মাত্রও সংশয় থাকিতে পারে না। জ্যামিতির মূলতত্ত্ব-সকলের যেরূপ প্রামাণিকতা—উহারও অবিকল সেইরূপ; উহার বিরুদ্ধে কাহারো কোন কথা চলিতে পারে না। যদি কোন জ্ঞাতা এক সময়ে এরূপ কোন একটি জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারেন, যাহাকে তিনি তাঁহার আপনার জ্ঞান বলিয়া জানিতে বাধ্য নহেন, তবে সকল সময়েই তিনি ঐরূপ করিতে পারেন। তাহা হইলে এমনও জ্ঞাতা থাকিবার আটক নাই যে, তাঁহার জ্ঞান সম্পূর্ণই আছে, অথচ তাঁহার সমস্ত জীবনের মধ্যে একবারও এ-টি তাঁহার খবরে আসিতেছে না যে, সে জ্ঞান তাঁহার নিজের জ্ঞান। এরূপ কল্পনা কি স্ববিরোধী নহে? তাহা যদি হয় তবে "কোন একজন জ্ঞাতা তাঁহার কোন একটি সময়ের কোন একটি জ্ঞানকে তাঁহার আপনার জ্ঞান বলিয়া জানিতেছেন না" ইহাও সেইরূপ স্ববিরোধী। মনুষ্যের জ্ঞান আছে; এবং মনুষ্য তখনই আপনার জ্ঞানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে, যখন সে তাহাকে আপনার বলিয়া উপলব্ধি করে। সে যদি তাহাকে আপনার বলিয়া উপলব্ধি না করে, তবে সে আদবেই তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। "আমি জানিতেছি" ইহা না জানিয়া আমি কিছুই জানিতে পারি না। মনুষ্য যাহা কিছু জানে, তাহারই সঙ্গে, ইহা তাহাকে অগত্যা জানিতে হয় যে, সে আপনিই জানিতেছে। সকল জ্ঞানের সঙ্গেই আত্মজ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। প্রথম সিদ্ধান্তটি যে, এইরূপ অবশ্যম্ভাবী প্রতীয়মান হইতেছে,—এমনি অবশ্যম্ভাবী যে, তাহার বিপরীত পক্ষ স্ববিরোধী অর্থাৎ নিতান্তই অর্থ শূন্য প্রলাপোক্তি, এ যে হইতেছে—এ কেবল প্রজ্ঞারই প্রসাদাৎ।

প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ॥১২॥

প্রত্যেক দার্শনিক সত্যের বিরুদ্ধে লৌকিক চিন্তা-মূলক এক একটি ভ্রম দণ্ডায়মান রহিয়াছে; আর, সেই-সকল ভ্রমের উন্মূলন তত্ত্বজ্ঞানেরই কার্য্য। উপক্রমণিকার প্রতিজ্ঞাত প্রণালী অনুসারে যদি বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটিকে তাহার সম্মুখে আনিয়া বলিদানার্থে উপস্থিত করা যায়, তবে তাহাতে বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের মর্ম্ম অতীব বিসদ-রূপে পরিস্ফুট হয়।

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ॥১॥

জ্ঞান-সিদ্ধির জন্য এক যাহা আবশ্যক তাহা এই যে, একটি জ্ঞাতব্য বিষয় এবং এক জন জ্ঞাতা, উভয়ে পরস্পর-সন্নিধানে উপস্থিত থাকিবে; কিন্তু তৎকালে জ্ঞাতা যে, আপনাকে আপনি জানিবে, ইহার বিশেষ কোন বাধ্য-বাধকতা নাই।

এই প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটি লৌকিক চিন্তা এবং মনোবিজ্ঞানের মর্ম্ম কথা ॥১৩॥

লৌকিক চিন্তার মতানুসারে, শুধু তা নয়—প্রচলিত মনোবিজ্ঞানেরও মতানুসারে, জ্ঞান-সিদ্ধির পক্ষে যাহা নিতান্তই নহিলে নয়, তাহাই এই প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তে ব্যক্ত করিয়া বলা হইল। জ্ঞানের একটি আশয়†

* কোন বেদান্ত গ্রন্থে আছে—"মানং প্রবোধয়ন্তং বোধং যে মানেন বুভুৎসন্তে। এধোভিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহা সুধিয়ঃ॥" ইহার অর্থ এই যে, যে জ্ঞান প্রমাণের প্রমাণত্ব সাধন করে—সেই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে যাঁহারা প্রমাণ-দ্বারা বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা করেন এই যে, যে অগ্নি ইন্ধনকে দহন করে—সেই অগ্নিকে তাঁহারা ইন্ধন দ্বারা দহন করিতে ইচ্ছা করেন।

† আশয় শব্দের অর্থ অভিধানে এইরূপ পাওয়া যায়,—আধার, মন, বাসনা। জলাশয় (জলের আশয়) বলিতে যেমন জলময় জলের আধার বুঝায়, জ্ঞানের আশয় বলিতে সেইরূপ জ্ঞানময় জ্ঞানের আধার বুঝায়;

(যেমন তুমি, আমি বা আর যে কোন ব্যক্তি) ও জ্ঞানের একটি বিষয় (যেমন ঘট, পট বা আর যাহা কিছু), এই দুইটি পরস্পরের সন্নিকৃষ্ট হইলেই তাহার ফল দাঁড়াইবে—জ্ঞান। সাধারণ লোকদিগের এবং মনোবিজ্ঞানীদিগের মতে জ্ঞানোৎপত্তির মূল বৃত্তান্ত ইহার অধিক আর কিছুই নহে। আমরা এই বলি যে, বিষয়কে (ঘট পটাদিকে) জানিতে হইলে—আশয়কে (আপনাকে) তাহার সঙ্গে জানা চাই-ই চাই। প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটি আমাদের এ কথার বিরুদ্ধে স্পষ্ট কিছুই বলে না। প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটি যদি স্পষ্ট রূপে আমাদের কথা অস্বীকার করে, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা সে করে না; তবে আমাদের কথা স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করুক্—তাহাও করে না; কেবল গোঁজা মিলন দিতে চেষ্টা করে; এই জন্য তাহার সহিত পারিয়া ওঠা ভার। কিন্তু ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের কথা অস্বীকার করিবার দিকেই প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের বেশী ঝোঁক। প্রচলিত মনোবিজ্ঞানের মতানুসারে এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে, আশয় (Subject) এবং বিষয় (Object) উভয়ে পরস্পর-সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, কখনো বা, আশয় বিষয়কে বাদ দিয়া আপনাকে জানিয়া থাকে; কখনো বা আপনাকে বাদ দিয়া বিষয়কে জানিয়া থাকে; কখনো বা আপনাকে এবং বিষয়কে যুগপৎ জানিয়া থাকে। মনোবিজ্ঞানের প্রকৃত কথা এই যে, আশয় (অর্থাৎ জ্ঞাতা) বিষয়-সন্নিধানে উপস্থিত থাকিলেই জ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে—তা'সে আত্মজ্ঞান সহকারেই উপস্থিত থাকুক, আর, আত্মজ্ঞান-ব্যতিরেকেই উপস্থিত থাকুক—তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। মনোবিজ্ঞানের মতে, বিষয়ের সন্নিধানে আশয়ের উপস্থিতি যেমন জ্ঞান-সিদ্ধির পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজনীয়—আশয়ের আত্ম-জ্ঞান সেরূপ প্রয়োজনীয় নহে। তবেই হইতেছে যে, আত্ম জ্ঞান-ব্যতিরেকেও অন্যান্য জ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে—ইহাই মনো বিজ্ঞানের ভিতরকার কথা; প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত সেই কথাটি স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিতেছে।

ভিতরে যেখানে জ্ঞান নিলীন থাকে তাহাই জ্ঞানের আশয় (Subject), বাহিরে যেখানে জ্ঞান বিলীন হয় তাহাই জ্ঞানের বিষয় (Object)।

প্রথম সিদ্ধান্ত যেমন তত্ত্বজ্ঞানের গোড়ার কথা, প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত সেইরূপ মনোবিজ্ঞানের গোড়ার কথা ॥ ১৪ ॥

প্রচলিত মনোবিজ্ঞানে এই প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটির স্পষ্ট কোন উল্লেখ যদিচ নাই, কিন্তু তাহার চরম সিদ্ধান্ত যেরূপ—তাহাতে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ঐটিই তাহার গোড়ার কথা। কেননা প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া রীতিমত যুক্তি-মার্গ অনুসরণ করিলেই মনোবিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্তে অগত্যা আসিয়া পড়িতে হয়; কিন্তু আমাদের প্রথম সিদ্ধান্ত হইতে যাত্রারম্ভ করিলে, যদি নিতান্ত অযুক্তির পথ অবলম্বন করা যায় তবেই যা'—নচেৎ কোন যুক্তির পথ দিয়াই মনোবিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে না। এজন্য যদি বলি যে, আমাদের প্রথম সিদ্ধান্তটিই মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি মূল, তবে প্রকারান্তরে বলা হয় যে, মনোবিজ্ঞান অযৌক্তিকের এক শেষ; এরূপ কটূক্তি প্রয়োগ না করিয়া এই কথা বলাই ন্যায়-সঙ্গত যে, আমাদের প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটিই মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিমূল; যদিচ, সে সিদ্ধান্ত একটি স্ববিঘাত-গর্ত্ত মূর্ত্তিমতী অনবধানতা ভিন্ন আর কিছুই নহে, ও তাহার দোষে মনোবিজ্ঞানের সকল

সিদ্ধান্তই অসত্যে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। একদিকে প্রচলিত মনোবিজ্ঞান, আর এক দিকে যথার্থ তত্ত্ব-জ্ঞান; মনোবিজ্ঞান লৌকিক-চিন্তা-সুলভ ভ্রম-সিদ্ধান্তের পক্ষ অবলম্বন করে, তত্ত্বজ্ঞান বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রকৃত তত্ত্ব সকলের পরিচয় প্রদান করে; প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটি মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি, প্রথম সিদ্ধান্তটি তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তি-ভূমি; দুয়ের মধ্যে যে, কিরূপ মর্ম্মান্তিক বিরোধ, তাহা দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে ফুটিয়া বাহির হইবে।

সপক্ষ এবং প্রতিপক্ষ দুইরূপ সিদ্ধান্তের প্রভেদ-চিহ্ন ॥ ১৫ ॥

সপক্ষ এবং প্রতিপক্ষ দুইরূপ সিদ্ধান্তের বৈপরীত্য স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিতে হইলে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, যাহা আমরা সত্য সত্যই ভাবি—সপক্ষ সিদ্ধান্ত তাহাই আমাদিগকে বলে; আর, যাহা আমরা ভাবি—ভাবি, কিন্তু বাস্তবিক ভাবি না, তাহাই প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত আমাদিগকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বলে; অর্থাৎ সপক্ষ সিদ্ধান্ত বাস্তবিক চিন্তার পরিচায়ক, পতিপক্ষ সিদ্ধান্ত কাল্পনিক চিন্তার পরিচায়ক। তাহার সাক্ষী;—প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত বলিতেছে যে, আমরা আপনাকে না জানিয়াও অন্যান্য বস্তু জানিয়া থাকি; সহসা এইরূপ আমাদের মনে হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা একটি অসম্ভব ব্যাপার। সহসা আমরা ভাবি যে, আমরা আপনাকে না জানিয়াও অন্যান্য বস্তু জানিয়া থাকি; অথবা যাহা একই কথা—আমরা একটি স্ববিরোধী ব্যাপার ভাবি,—বাস্তবিক যে, ভাবি, তাহা নহে—কেননা যাহা স্ববিরোধী তাহার ভাবনা হইতেই পারে না,—যেন ভাবিতেছি এইরূপ একটা ভান করিয়া মনকে প্রবোধ দিই মাত্র। কিন্তু সপক্ষ সিদ্ধান্ত যাহা বলে, তাহা আমরা সত্য-সত্যই ভাবি—সত্য সত্যই জানি।

পিথাগোরীয় সাংখ্য সিদ্ধান্তের সহিত প্রথম সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য ॥ ১৬ ॥

অজ্ঞেয় কি-প্রকারে জ্ঞেয়-রূপে পরিণত হয়—তাহারই নিয়ম প্রথম সিদ্ধান্তে ব্যক্ত হইল। আপনাকে উপলব্ধি করা হউক—তাহা হইলেই সমস্ত বিষয় (সম্ভবতঃ) উপলব্ধি-সাধ্য হইবে—জ্ঞান-সাধ্য হইবে; আর আপনাকে অনুপলব্ধি করা হউক্—তাহা হইলে কোন বিষয়ই উপলব্ধি-সাধ্য হইবে না—জ্ঞান-সাধ্য হইবে না। পিথাগোরসের এই যে, একটি সিদ্ধান্ত যে, সংখ্যাই জ্ঞেয়ত্বের ভিত্তি-ভূমি, ইহা বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের অনেকটা কাছাকাছি যায়। প্রকৃতিকে যদি জ্ঞানের সহিত সম্পর্ক-রহিত করিয়া ভাবা যায়, তবে তাহার না একত্বই থাকে—না অনেকত্বই থাকে; তাহা হইলে কোন কিছু-কেই এক বলিতে পারা যায় না, কোন-কিছু-কেই অনেক বলিতে পারা যায় না; কারণ, জ্ঞান যতক্ষণ না অনেককে, বা অনেক অংশকে, এক সূত্রে গ্রথিত করে, ততক্ষণ কোন বস্তুই এক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না; একত্ব যখন জ্ঞান-মূলক, তখন অনেকত্বও কাজে কাজেই জ্ঞান-মূলক; কেন না, অনেকত্ব একত্বেরই প্রবাহ,—অনেকের প্রত্যেকেই এক হওয়া চাই, নতুবা তাহারা অনেক হইতে পারে না; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানকে সরাইলে—জ্ঞানের যোগ-সূত্র প্রত্যাহরণ করিলে—প্রকৃতিতে ঐকান্তিক অচিন্তনীয়তা ভিন্ন আর কিছুই থাকে না—একত্বও থাকে না—অনেকত্বও থাকে না। প্রকৃতি যদিবা আমাদিগকে বস্তু আনিয়া দেয়—তথাপি "এক" বস্তু আনিয়া দিতে পারে না। পিথাগোরস এই কথা বলেন। ইহাঁর মতে জ্ঞাতাই কেবল বস্তুতে একত্ব আরোপ করিতে পারে; এ নহে যে, জ্ঞাতা অনেকত্বে একত্বের আরোপ করে (কেননা অনেকত্বের

গোড়াতেই একত্ব রহিয়াছে—একত্ব ভিন্ন অনেকত্ব হইতেই পারে না) ; তবে কি ? না যাহা "একও নহে—অনেকও নহে" এইরূপ জ্ঞান-বিরুদ্ধ ব্যাপার, তাহাতেই জ্ঞাতা একত্ব আরোপ করে ; আর, সেইরূপ করিয়াই অজ্ঞেয়কে জ্ঞেয় করিয়া তোলে, অর্থ-শূন্য প্রমাদ রাজ্যকে জ্ঞান-রাজ্য করিয়া তোলে।

পিথোগোরীয় মতের বিপরীত অর্থ-বোধ ॥ ১৭ ॥

পিথাগোরসের এই মতটির অনেকে আশ্চর্য্যরূপ উল্টা অর্থ বুঝিয়া থাকেন। এই মতের ব্যাখ্যা-কর্ত্তারা সচরাচর এইরূপ বুঝিয়া আসিতেছেন যে, প্রকৃতি পূর্ব্বাহ্নেই বস্তু-সকলের সংখ্যা গননা করিয়া ঠিক্ ঠাক্ করিয়া রাখিয়াছে ; সেই সকল বস্তু যখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন আমরা তাহাদিগকে পুন-র্গননা করি মাত্র ; এরূপ একটা অকিঞ্চিৎকর কথা একজন উচ্চ-শ্রেণীর তত্ত্বজ্ঞের মুখ হইতে বাহির হওয়া যেন সত্য সত্যই সম্ভবে ! কেমন করিয়া বস্তু-সকল অজ্ঞেয়তা হইতে জ্ঞেয়ত্বে উপনীত হয়—এইটিই এখনকার প্রশ্ন ; ইহার কি এই উত্তর যে, জ্ঞেয়ত্বে উপনীত হইবার পূর্ব্ব হইতেই তাহারা জ্ঞেয় হইয়া বসিয়া আছে ! তবে, জল কিরূপে বরফ হয়—ইহা বুঝাইবার সময় ব্যাখ্যা-কর্ত্তা এই বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকুন্ না কেন যে, জল পূর্ব্ব হইতেই বরফ হইয়া আছে ! তাহা তো আর হইতে পারে না—জলের পূর্ব্বতন তরল অবস্থা হইতেই তাঁহাকে তাঁহার ব্যাখ্যার গোড়া পত্তন করিতে হইবে। এরূপ সত্ত্বেও, পিথাগোরসের ঐ যে, একটি সিদ্ধান্ত যে, জ্ঞেয়ত্ব সংখ্যামূলক, উহার অর্থ উল্টাইয়া দিয়া উহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া দাঁড় করানো হইয়াছে। সংখ্যা (অর্থাৎ একত্ব বা অনেকত্ব) বস্তু-সকলের জ্ঞান-বহির্ভূত অবস্থাতেও বস্তু-সকলের গাত্রে অঙ্কিত থাকে—এ কথা পিথাগোরসের কথা নহে। তাহা যদি হইত, তবে বস্তু সকল গোড়াগুড়িই জ্ঞেয় হইত ; তাহা হইলে "অজ্ঞেয় কি প্রকারে জ্ঞেয়-রূপে পরিণত হয়" এরূপ একটা প্রশ্নই উঠিতে পারিত না। পিথাগোরসের সাংখ্য সিদ্ধান্ত অসম্পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু উহা প্রাচীন-কালের একটি প্রগাঢ় চিন্তার ফল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পিথাগোরসের সিদ্ধান্তের সার মর্ম্ম যে-টি, সেইটিই উড়াইয়া দিয়া আধুনিক পণ্ডিতেরা উহাকে নিতান্তই অর্থ-শূন্য করিয়া ছাড়িয়াছেন।

পিথাগোরীয় নিয়মের ব্যাপকতর মূর্ত্তি ॥ ১৮ ॥

এই প্রথম সিদ্ধান্তে যে নিয়মটি বিন্যস্ত হইল, তাহা পিথাগোরীয় সাংখ্য নিয়মের উচ্চতর ব্যাপ্তি, এবং স্পষ্টতর বিকাশ। কোন বস্তুকে কাহারো নিকট জ্ঞাত হইতে হইলেই, সে বস্তুকে, হয় এক, নয় অনেক, নয় অনেকের সমষ্টি, বলিয়া জ্ঞাত হইতে হইবে ; কিন্তু এক-আত্মার সহিত সম্পর্ক সূত্রেই জ্ঞাতব্য বিষয় এক বলিয়া অবধারিত হইতে পারে ; আর, জ্ঞাতব্য বিষয়-সমূহের প্রত্যেকে এক বলিয়া অবধারিত হইলে, তবেই তাহারা সাকল্যে অনেক বলিয়া অবধারিত হইতে পারে ; পুনশ্চ এক আত্মার সহিত সম্পর্ক সূত্রেই অনেক বস্তুর সমষ্টি অনেকাত্মক এক বলিয়া অবধারিত হইতে পারে।

জর্ম্মান দেশীয় তত্ত্বজ্ঞদিগের গ্রন্থে বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের পূর্ব্বাভাস ॥ ১৯ ॥

মাঝখানকার অন্যান্য সদৃশ-প্রায় সিদ্ধান্ত সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া আমরা জর্ম্মান দেশীয় তত্ত্বজ্ঞদিগের গ্রন্থে আমাদের এই প্রথম সিদ্ধান্তের পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাই। বর্ত্তমান সংহিতা এই প্রথম সিদ্ধান্তটিকে যতই কেন নূতন বিষয়ে নূতন ভাবে প্রয়োগ করুক না, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহা যে, সর্ব্বাংশেই

নূতন, তাহা নহে। কাণ্ট বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের কতক কতক আভাস পাইয়াছিলেন, কিন্তু জ্ঞানের—যৌগিক এবং রূঢ়িক—এই দুই প্রকার একত্বের প্রভেদ দেখাইতে গিয়া তিনি বড়ই গোলে পড়িয়াছেন। ১ কাণ্টের গ্রন্থ-মধ্যে যে-কয়েকটি স্থানের অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া অসাধ্য-ব্যাপার, এই স্থানটি তাহাদেরই দল-ভুক্ত। কাণ্টের হস্তে এখানকার প্রদর্শিত জ্ঞানের মূল নিয়মটি কোন কার্য্যেরই হয় নাই। কাণ্টের দর্শন-শাস্ত্রে উহা ভূমিষ্ঠ হইতে-না-হইতেই মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইয়াছিল,—উহার নিশ্বাস-ক্রিয়া আরম্ভ হইতে-না-হইতেই উহা আশপাশের কতক-গুলা আনুষঙ্গিক বিবেচনায় মাটি-চাপা পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। ফিক্‌টে (কাণ্টের স্বদেশীয় পরবর্ত্তী তত্ত্ববিৎ) উহাকে মুঠার মধ্যে পাইয়াছিলেন, কিন্তু হারাইয়া ফেলিলেন; আবার পাইলেন—আবার হারাইলেন; এইরূপ করিয়া ক্রমান্বয়ে তাঁহার আট-দশখানা গ্রন্থ পার হইয়া গেল; তাহার পর যেই তিনি উহাকে কাজে লাগাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন—অমনি উহা তাঁহার হস্ত হইয়া খসিয়া পড়ি-

১ কাণ্টের মতে জ্ঞানের একত্ব দুইরূপ; বাহ্য বিষয়-সংক্রান্ত জ্ঞানের একত্ব—অর্থাৎ জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের প্রত্যেকেই এক—এবং এক এক করিয়া তাহারা অনেক—ও তাহারা সকলে মিলিয়া অনেকের সমষ্টি—এইরূপ যে বাহ্য-বিষয়-ঘটিত একত্ব—ইহাই কাণ্টের মতে যৌগিক একত্ব; কিন্তু আত্মার নিজের যে, একত্ব, তাহা কাণ্টের মতে রূঢ়িক একত্ব। একটা টাকাকে আমরা এক বলিয়া গ্রহণ করি; কিন্তু আমরা মনে মনে তাহার মাঝখানে একটি রেখা কাটিয়া তাহাকে যদি দুইটি অর্দ্ধচন্দ্রে বিভক্ত করি, ও প্রত্যেক অর্দ্ধচন্দ্রকে যদি অর্দ্ধ মুদ্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তবে তাহা এক টাকার পরিবর্ত্তে দুই অর্দ্ধ মুদ্রা হইয়া দাঁড়াইবে। এক টাকা বলিতেও আমরাই তাহা বলি—দুই অর্দ্ধ মুদ্রা বলিতেও আমরাই তাহা বলি,—টাকা নিজে একও নহে—দুইও নহে; আমরা যদি তাহার দুই অর্দ্ধখণ্ডকে স্বতন্ত্র করিয়া না দেখি—তবেই তাহা এক,—নচেৎ তাহা দুই। অতএব টাকার যে, একত্ব, তাহা টাকার নিজের একত্ব নহে কিন্তু আমাদের আরোপ করা একত্ব; এইরূপ জ্ঞান-কর্ত্তৃক যে একত্ব বহির্বিষয়েতে জুড়িয়া দেওয়া হয়, তাহাই যৌগিক একত্ব; কিন্তু আত্মার নিজের একত্ব সেরূপ বহির্বস্তুতে জুড়িয়া দেওয়া একত্ব নহে—আরোপিত একত্ব নহে,—আত্মার একত্ব যৌগিক নহে—তাহা রূঢ়িক। কিন্তু কাণ্টের এই কথার ভিতর একটু গোলোযোগ আছে। বহির্বিষয়ের যে, একত্ব, তাহা জ্ঞানেরই একত্ব—তাহা জ্ঞান-কর্ত্তৃক বহির্বিষয়েতে আরোপিত হয় মাত্র; ইহা সত্য; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বহির্বস্তুর সেই যে, একত্ব, তাহা কি বাহির হইতে যুড়িয়া দেওয়া—না তাহা বহির্বস্তুর অন্তর্ভূত? কাণ্ট বলেন তাহা বাহির হইতে যুড়িয়া দেওয়া সুতরাং তাহা যৌগিক। কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থকারের মতে, বহির্বস্তু বলিবা-মাত্রই জ্ঞানের অন্তর্ভূত বহির্বস্তু বুঝায়; এখানকার মতে জ্ঞান-বহির্ভূত বহির্বস্তু জ্ঞানের বিষয়ই নহে—তাহা স্ববিরোধী এবং অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যা। সেই স্ববিরোধী এবং অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যা—যাহাকে আমরা জ্ঞান-বহির্ভূত বহির্বস্তু বলি—তাহা একেবারেই জ্ঞানের অবিষয়; তাহা যদি জ্ঞানের বিষয় হইত, তবেই বলা যাইতে পারিত যে, তাহাতে, বাহির হইতে একত্ব যুড়িয়া দেওয়া হইতেছে; কিন্তু বাস্তবিক এই যে, জ্ঞান-সংকৃত বিষয়ই বিষয়—একত্ব সংকৃত বিষয়ই বিষয়, সুতরাং একত্ব বিষয়ের অন্তর্ভূত; এই হিসাবে তাহা রূঢ়িক। এখানে এইটি দেখা আবশ্যক যে, জ্ঞানের অবিষয় যে, অবিদ্যা, একত্ব তাহার অন্তর্ভূত নহে; সুতরাং তাহাতে—সেই জ্ঞানের অবিষয় অবিদ্যাতে—একত্ব বাহির হইতে জুড়িয়া দেওয়া হয়—ইহা খুবই সত্য; কিন্তু কাণ্ট যে অর্থে যৌগিক এবং রূঢ়িক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন—তাহা তিনি জ্ঞানের বিষয় উপলক্ষেই প্রয়োগ করিয়াছেন—অবিষয় উপলক্ষে নহে; দুইটি অনুভাব (Concept)—উভয়েই জ্ঞানের বিষয়—এবং উভয়ে পরস্পরের সহিত যোগযুক্ত—এই উপলক্ষেই তিনি যৌগিক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। "জড়-পিণ্ড মাত্রেরই গুরুত্ব আছে" এখানে জড়পিণ্ডও জ্ঞানের বিষয় এবং গুরুত্বও জ্ঞানের বিষয়—এই দুই বিষয়ের যোগ (নৈয়ায়িক ভাষায়—"সামানাধিকরণ্য") নিরূপিত হইতেছে; এইরূপ জ্ঞানের "বিষয়" উপলক্ষেই কাণ্ট্ বলেন যে, গুরুত্বের ভাব জড়-পিণ্ডের উপর বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া—তাই তাহা যৌগিক শব্দের বাচ্য। কিন্তু, জ্ঞানের "বিষয়ের" উপরে তো একত্ব বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া হয় না—জ্ঞানের অবিষয়ের উপরেই একত্ব চাপাইয়া তাহাকে বিষয় করিয়া তোলা হয়; এ জন্য জ্ঞানের কোন "বিষয়" উপলক্ষে একথা বলা সঙ্গত নহে যে, তাহার একত্ব রূঢ়িক নহে কিন্তু যৌগিক। কাণ্টের যত কিছু গোলমাল—সমস্তের সূত্রপাত এইখানটিতে। কাণ্টের সঙ্গে বর্ত্তমান গ্রন্থকারের কোথায় কোথায় বিরোধ তাহা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়—এ ক্ষুদ্র টিপ্পনী তাহার স্থান নহে; এখানে উক্ত বিরোধের স্বল্প একটু আভাস যাহা দেওয়া হইল তাহাই যথেষ্ট।

অনুবাদক।

য়াছে। সেলিঙ্ তাঁহার যৌবনের প্রথম উদ্যমের সময় আমাদের এই সিদ্ধান্তের অনুরূপ একটি সিদ্ধান্তে ভর করিয়া অনেক ভাবি মহদ্ব্যাপারের পূর্ব্বাভাস উদ্গীরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া জগৎ তাঁহার গর্জ্জনের অনুরূপ বর্ষণ প্রতীক্ষা করিতেছে। ঈশ্বর করুন্ জগতের সে আশা একদিন ফলবতী হয়। দর্শন-শাস্ত্র শুধু যে কেবল একটা বিশাল মরু-ভূমি নহে, তাহা সপ্রমাণ করিতে এই অশীতি বর্ষীয় ঋষি যেমন সুপারক, এমন আর কেহই নহে,—একটু-যদি-কেবল শ্রম স্বীকার করেন। হেগেল,—কিন্তু হেগেলের বিষয়ে—বুঝিতে-সুঝিতে পারা যায় এমন একটা কথা আজ পর্য্যন্ত কে উচ্চারণ করিয়াছে? তাঁহার স্বদেশীয় কোন ব্যক্তি নহে—বিদেশীয় কোন ব্যক্তি নহে—তিনি নিজে তাহা করিয়াছেন কি না সন্দেহ। তাঁহার গ্রন্থের এখানে ওখানে সেখানে এক-একটা শিখর সূর্য্য অপেক্ষাও সমুজ্জল—কিন্তু মাঝখানের সমস্ত ব্যবধান এমনি অন্ধকার-সাগরে নিমগ্ন যে, কোন দিক্-দর্শনী শলাকারই সেখানে বাক্স্ফূর্ত্তি হয় না; আর,সেখানকার বায়ু এমনি যে, তাহাকে শূন্য বলিলেই হয়—তাহাতে মনুষ্য-বুদ্ধির নিশ্বাস-ক্রিয়া চলিতে পারে না। হেগেলের বিষয়ে এখানে কোন কথার উল্লেখ না করিয়া চুপ থাকাই ভাল। হেগেলের মতের সহিত বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের কত দূর ঐক্য বা অনৈক্য তাহা ঠিক্ করিয়া ওঠা অসাধ্য ব্যাপার। কারণ, হেগেলের ভিতর যতই কেন সত্য থাকুক্ না,—যেমন দুগ্ধ জাল দিয়া তাহা হইতে ঘৃত নিঃসারণ করা যায় না, সেইরূপ হেগেলের গ্রন্থ অধ্যয়ন-মাত্র করিয়া তাহা হইতে অর্থ বাহির করা যায় না। হেগেলের গ্রন্থ মন্থন করা আবশ্যক; তত্ত্ববিৎগণের গ্রন্থ মাত্রই মন্থনাপেক্ষী—কিন্তু হেগেলের গ্রন্থ বিপর্য্যয় অতিরিক্ত মাত্রায়। হেগেলের ব্যাখ্যানুসারে সত্য বুঝিতে যাওয়া অপেক্ষা—আপনার বুদ্ধি-ব্যয় করিয়া সত্য ক্রয় করিলে সত্য অনেক সুলভ-মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে। হেগেল এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কাণ্টের উত্তরাধিকারীদিগের যত কিছু দোষ—সমস্তই—শুধু কেবল ভাষা-সম্বন্ধীয়, বিষয়-সম্বন্ধীয় নহে। তাঁহাদের ভাব অর্থ এবং উদ্দেশ্য অতি চমৎকার, কিন্তু তাঁহাদের বাক্য-বিন্যাস এমনি কদর্য্য যে, তাহার ভিতর তলানো দুষ্কর; আর, দার্শনিক অনুসন্ধানের পদ্ধতি এবং ফলের প্রতি মনুষ্যের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে লেখকের যে যে গুণ অত্যাবশ্যক, সে রসে তাঁহারা একেবারেই বঞ্চিত।

প্রথম সিদ্ধান্ত সমাপ্ত।

ক্রমশঃ।

মহদ্বাক্য।*

(১)

প্রত্যেক মানবের অন্তরেই স্বর্গ বিরাজ করিতেছে। প্রত্যেক মহৎ কার্য্যই স্বর্গ। তৃষ্ণাতুর পথিককে জল প্রদান কর; অন্তরে স্বর্গ সুখ পাইবে। পিতৃ মাতৃহীন শিশুকে আশ্রয় দেও; অন্তরে স্বর্গ সুখ পাইবে। পীড়িতের যন্ত্রণা দূর করিতে যত্ন কর; অন্তরে স্বর্গ সুখ পাইবে। বিপথগামীকে সুপথে পৌছাইয়া দেও; অন্তরে স্বর্গ সুখ পাইবে। দুঃখার্ত্ত ব্যক্তির দুঃখ মোচন কর; অন্তরে স্বর্গ সুখ পাইবে। ক্ষীণ মানবকে ধর্ম্ম পথে আকৃষ্ট কর; অন্তরে স্বর্গ সুখ পাইবে।

(২)

আত্ম বিসর্জ্জনই জীবনের প্রকৃত মহত্ব।

(৩)

পবিত্র ও মহৎ কার্য্যের পুরস্কার বাহিরে নহে, অন্তরে।

(৪)

নিরন্তর অমঙ্গলের সহিত ও অসত্যের সহিত সংগ্রাম করা, ত্যাগ স্বীকার করা, দুর্ব্বলকে বল, অন্ধকে দৃষ্টি,

* বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত ও অনুবাদিত।

আশাহীনকে আশা প্রদান করা, অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানালোক বিস্তার করা—নিঃস্বার্থভাবে এই সকল করিয়া সন্তুষ্ট থাকাই আমাদের জীবনের কার্য্য।

(৫)

বিদ্বেষ ভাব দূর করিয়া প্রেমকে আলিঙ্গন কর; কেননা ঈশ্বরের রাজ্যে বিদ্বেষ ভাবাপন্নের মহা ক্লেশ।

(৬)

অসংখ্য লোকের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করা মহত্ত্ব নহে; অসংখ্য লোকের সেবা করাই মহত্ত্ব।

(৭)

ধনী কে? তিনিই ধনী যাঁহার ঈশ্বর প্রদত্ত সকল ক্ষমতা, সকল বৃত্তি গুলি সর্ব্বদা পবিত্র ও সুস্থ অবস্থায় অবস্থিত ও সমঞ্জসীভূত ভাবে কার্য্যে নিযুক্ত।

(৮)

অতি সামান্য বিষয়েও ন্যায়ের আদেশানুসারে কার্য্য কর, তাহা হইলে প্রধান বিষয়ে ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য করা অসম্ভব হইবে।

(৯)

জগৎ হইতে অসত্য ও অমূলক সংস্কার দূর করাই প্রতিভান্বিত ব্যক্তির কার্য্য।

(১০)

যদি কোন মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে, অথচ বলে যে সে ঈশ্বরের প্রেমিক, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।

(১১)

সম্মুখে যে কার্য্য পাইবে তাহাই করিবে, তাহা হইলে তৎপরে কি করিতে হইবে তাহা দেখিতে পাইবে।

(১২)

মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই মঙ্গল সম্পাদন করিবে, তাহা হইলে মঙ্গল তোমার সহগামী হইবে।

(১৩)

স্বর্ণ ও রৌপ্য অপেক্ষা কত মূল্যবান পদার্থ এই পৃথিবীতে রহিয়াছে, কিন্তু মানুষ কি মূর্খ! সে প্রকৃত মূল্যবান পদার্থ আহরণে চেষ্টিত হয় না।

(১৪)

যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে সে কখন নিরাশ হয় না।

(১৫)

সকল মানুষের যদি ঈশ্বরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে কেহই দুঃখ শোকে কাতর হইত না।

(১৬)

তুমি যখন লোকের দুঃখ দূর করিবার জন্য যত্ন করিতেছ না, তখন তুমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিওনা যে "হে ঈশ্বর মানব জাতির দুঃখ মোচন কর," কেন না তুমি ঐ প্রার্থনা করিবার অধিকারী নহ।

(১৭)

এখানে তুমি ঈশ্বরের আশ্রিত, পরকালেও তাঁহার নিকটতর আশ্রয়ে তুমি বাস করিবে, তবে হে মানব, কেন ভীত হইতেছ?

(১৮)

যাহার যতটুকু ঈশ্বরবত্তা, তাহার ততটুকু সৌন্দর্য্য।

(১৯)

পবিত্র অবিকৃত হৃদয়ই সর্ব্বোত্তম উপদেষ্টা; ঈশ্বরই সর্ব্বোত্তম বন্ধু; সময়ই সর্ব্বোত্তম শিক্ষাদাতা; জগতই সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ।

(২০)

বিশাল সৌরজগৎ যেমন ঈশ্বরের অনন্তত্বের পরিচয় দেয়, তেমনি এই পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র বালুকণাও তাঁহার পূর্ণতা প্রকাশ করে।

(২১)

প্রেমই সকল বস্তুর আদি ও অন্ত।

(২২)

কে জ্ঞানী হইতে পারে? যিনি সকল বস্তু ও সকল লোকের নিকট হইতে সত্য গ্রহণ করেন।

(২৩)

সত্যের প্রতি প্রেম যতই দৃঢ় হইবে, ততই তুমি ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইবে।

(২৪)

সর্ব্বাপেক্ষা মধুর কি? প্রেম। সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরানুরূপ কি? ধর্ম্ম জীবন। সর্ব্বাপেক্ষা মহান কি? ঈশ্বর। সর্ব্বাপেক্ষা সুখ-দায়ক কি? ঈশ্বর স্বরূপ চিন্তা, ও পরোপকার।

(২৫)

অন্যকে কষ্ট দেওয়া অপেক্ষা আপনি কষ্ট ভোগ করা ভাল, মানুষ তাহা বুঝেনা।

একাদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
পৌষ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭
৫২১ সংখ্যা
১৮০৮ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৬ অগ্রহায়ণ রবিবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭।

আচার্য্যের উপদেশ।

আমরা যদি আমাদের সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, আমরা বাহিরের সমস্ত জগতেরই অধীন। সূর্য্যমণ্ডলের কোথায় কি সাম্যের ব্যতিক্রম হয়—পৃথিবীতে আমরা তাহার ফল ভোগ করি; কোন্ দেশের কোথায় কি বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহার তরঙ্গ আসিয়া আমাদের ক্ষুদ্র কুটীরের ভিত্তি-মূল কাঁপাইয়া দেয়। সুখ-সৌভাগ্যেরও তরঙ্গ জগতের এক প্রান্তে উত্থিত হইলে, তাহার আর-এক প্রান্ত তাহা জানিতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এইরূপ অপরিহার্য্য অধীনতা-শৃঙ্খলে আপাদ মস্তক জড়িত হইয়াও মনুষ্য পারৎপক্ষে আপনার পরাধীনতা স্বীকার করিতে চাহে না। মনুষ্য আপনার পরাধীনতার স্মারক চিহ্ন জীবনের প্রতি ঘটনাতেই অঙ্কিত দেখিতেছে এবং মুহুর্মুহু তাহার ফল ভোগ করিতেছে—অথচ আপনার পরাধীনতা স্বীকার করিতে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। এরূপ হয় কেন? ইহার অবশ্য কোন নিগূঢ় কারণ থাকিবে। শুষ্ক-তার্কিক সে কারণ-টিকে কুসংস্কার বলিয়া এক কথায় উড়াইয়া দেন; তিনি বলেন যে, স্বাধীনতা-স্পৃহা মনুষ্যের একটা দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র;—পুরাণে কথিত আছে যে, অতীব পুরাকালে পর্ব্বতেরা পক্ষ-বিশিষ্ট ছিল,—পরে ইন্দ্রের নিক্ষিপ্ত বজ্রে তাহাদের পক্ষ বিধ্বস্ত হইয়া গেল; স্বাধীনতা-স্পৃহা মনুষ্যের অসংযত মনোবৃত্তির পক্ষ-স্বরূপ,—বিজ্ঞানের বজ্রে তাহা ছিন্ন-মূল হইয়া ধরাশায়ী হয়। বিজ্ঞান স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে যে, সমুদায় জগৎ কঠোর কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলায় ওত-প্রোত,—মনুষ্য জগৎছাড়া নহে, সকল বস্তু যেমন পরাধীন—মনুষ্যও সেইরূপ পরাধীন। বিজ্ঞান যে, অজ্ঞানের দলে মিশিয়া উচ্চৈঃস্বরে পরাধীনতার জয়-কীর্ত্তন করিবে—ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে,—কেননা অজ্ঞানের দল-গৌরব চিরকালই প্রসিদ্ধ; আশ্চর্য্য যাহা—তাহা আর-এক বিষয়; চারিদিকের পরাধীনতার মধ্য হইতে স্বাধীনতায় ভর করিয়া বিজ্ঞান কিরূপে অঙ্কুরিত এবং বর্দ্ধিত হইতে পারিল—ইহাই আশ্চর্য্য।

বিজ্ঞান মনুষ্যের স্বাধীনতার বিপক্ষে মুখে যাহাই বলুক না কেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার সপক্ষেই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। স্বাধীন চিন্তাই বিজ্ঞানের প্রাণ; বিজ্ঞান যদি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কোন কথা বলে, তবে সে তাহার আপনার প্রাণে আপনি আঘাত করে; বাস্তবিক বিজ্ঞান তাহা বলে না। বিজ্ঞানের ভিতরকার কথা এই যে, কোন বস্তুই এমন নহে যে, তাহা একেবারেই পরাধীন কিম্বা একেবারেই স্বাধীন,—জগতের সকল বস্তুই পরস্পরাধীন। যাঁহারা বিজ্ঞানের ভিতরকার কথা জানেন না, তাঁহারা হঠাৎ মনে করিতে পারেন যে, পৃথিবীই সূর্য্যের অধীন—সূর্য্য পৃথিবীর অধীন নহে। কিন্তু বিজ্ঞান আর-এক কথা বলে। বিজ্ঞান বলে এই যে, সূর্য্যের অনতিদূরে সমস্ত সৌর জগতের ভার-কেন্দ্র অবস্থিতি করে; সেই ভার-কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে সূর্য্যের মহৎ আকর্ষণে যেমন পৃথিবী ঘুরিতেছে—পৃথিবীর ক্ষুদ্র আকর্ষণেও সেইরূপ সূর্য্য ঘুরিতেছে। মনুষ্যের গার্হস্থ্য এবং সামাজিক ব্যাপারে এই পরস্পরাধীনতা আরো জাজ্বল্যতর-রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এক দিকে শিশু যেমন মাতার অধীন—আর এক দিকে মাতা তেমনি শিশুর অধীন; শিশুর একটু কিছু হইলেই মাতার প্রাণ বাহির হইয়া যায়। এক দিকে প্রজা যেমন রাজার অধীন, আর-এক দিকে রাজা তেমনি প্রজার অধীন; প্রজার দুর্ভিক্ষে রাজার রাজত্ব ঘুচিয়া যায়। সকল বস্তু পরস্পরাধীন—এ কথার অর্থই এই যে, প্রত্যেক বস্তু এক-অংশে স্বাধীন—আর এক অংশে পরাধীন। রাজা সর্ব্বাংশে প্রজার অধীন নহে—প্রজাও সর্ব্বাংশে রাজার অধীন নহে; যে অংশে প্রজা রাজার অধীন—সে অংশে রাজা প্রজার অধীন নহে—সুতরাং সে অংশে রাজা স্বাধীন; তেমনি আবার, যে অংশে রাজা প্রজার অধীন—সে অংশে প্রজা রাজার অধীন নহে—সুতরাং সে অংশে প্রজা স্বাধীন। পৃথিবী যে অংশে আর-সমস্ত সৌর জগতের অধীন, সেই অংশেই পৃথিবী পরাধীন; কিন্তু যে অংশে আর সমস্ত সৌর জগৎ পৃথিবীর অধীন—যে অংশে পৃথিবীর ভাল মন্দের উপর সমস্ত সৌর জগতের ভাল মন্দ নির্ভর করে—সে অংশে পৃথিবী স্বাধীন। সকল বস্তুই একাংশে স্বাধীন, আর এক অংশে পরাধীন। স্বাধীনতা সকল বস্তুরই অন্তরঙ্গ, পরাধীনতা সকল বস্তুরই বহিরঙ্গ। কিন্তু আর আর বস্তুর সহিত মনুষ্যের প্রভেদ এই যে, মনুষ্যের আত্মাতে সেই স্বাধীন অন্তরঙ্গ প্রদেশটি জ্ঞানোজ্জ্বল পরিস্ফুট ভাব ধারণ করিয়াছে। মনুষ্য আপনার স্বাধীনতার মর্ম্ম-রস আপনি আস্বাদন করিয়া অবগত হইয়াছে—প্রাণ গেলেও আর সে তাহাকে ছাড়িতে পারে না; মনুষ্য আপনার স্বাধীনতাকে জ্ঞানের মুষ্টি-মধ্যে পাইয়াছে—সর্ব্বসংহারী মৃত্যুও সে মুষ্টি হইতে সে অমূল্য রত্নটিকে কাড়িয়া লইতে পারে না। মনুষ্য শত সহস্র শৃঙ্খলায় আপাদ মস্তক জড়িত হইয়াও আপনার পরাধীনতা স্বীকার করিতে কেন-যে এত পরাঙ্মুখ, তাহা এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। মনুষ্য আপনার অভ্যন্তরে এমনি একটি অপূর্ব্ব চক্ষু দেখিতে পায় যে, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে প্রাণান্তেও মনুষ্যের মুখ হইতে এ কথা বাহির হইতে পারে না যে, "আমি পরাধীন।" সেই চক্ষুটি মনুষ্যের অন্তরাত্মা। মনুষ্যের চতুর্দ্দিকে পরাধীনতার ঝঞ্ঝাবাত তুমুল কোলাহলে বহিয়া যাইতেছে—কিন্তু তাঁহার আত্মার শান্তি নিকেতনে স্বাধীনতা নিরন্তর জাগিতেছে—সে অগ্নি কিছুতেই নির্ব্বাণ হইবার নহে।

জগতের প্রত্যেক বস্তুই একাংশে স্বাধীন আর-এক অংশে পরাধীন; মনুষ্যও সেইরূপ একাংশে স্বাধীন—আর এক অংশে পরাধীন; কিন্তু মনুষ্যের স্বাধীনতা জ্ঞান-জ্যোতিতে প্রদীপ্ত, আর আর-বস্তুর স্বাধীনতা অজ্ঞান-অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন। জ্ঞানবান্ মনুষ্য এবং অজ্ঞানাচ্ছন্ন বাহ্য প্রকৃতি উভয়ে পরস্পরাধীন; মনুষ্য একাংশে প্রকৃতির অধীন, আর-এক অংশে প্রকৃতিকে আপনার অধীনে চালনা করিতেছে,—ইহাই উভয়ের পরস্পরাধীনতা। এই পরস্পরাধীনতার মূল অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ পরমাত্মাই সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন পুরুষ—মনুষ্য যে অংশে তাঁহার সহিত যোগযুক্ত সেই অংশে স্বাধীন, এবং যে অংশে তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন সেই অংশে পরাধীন। জগতের সমস্ত স্বাধীনতা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ভূমা মহান্ পুরুষের মঙ্গল-জ্যোতির উচ্ছ্বাস; এবং সমস্ত পরাধীনতা সেই মঙ্গল জ্যোতির ছায়া। কর্ম্মচারী যেমন কর্ম্মক্ষেত্রে পরাধীন এবং বাটিতে আসিয়া স্বাধীন, মনুষ্য সেইরূপ সংসার-ক্ষেত্রে পরাধীন—ঈশ্বরের অমৃত নিকেতনে স্বাধীন। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম কখনই জগৎকে পরের রাজ্য মনে করেন না—তাই আপনাকে পরাধীন মনে করেন না। জগৎ তাঁহার পিতার রাজ্য বন্ধুর রাজ্য—তাই তাঁহার আপনার রাজ্য; তিনি জগতে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করেন—স্বাধীনভাবে সকল বস্তুর নিগূঢ় তত্ত্ব অন্বেষণ করেন—পাপের আবর্ত্ত ভিন্ন আর কোথাও তাঁহার বারণ নাই; বালক যেমন পিতাকে স্বাধীন-ভাবে সকল বস্তুরই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করে, মনুষ্য সেইরূপ করিয়া ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রকৃতির সমস্ত তত্ত্ব একে একে অবগত হয়। ঈশ্বরের ভক্ত সন্তানের নিকট সকল জগৎই আপনার। শুষ্ক বিজ্ঞান বলিতে পারে যে, সূর্য্য তো তোমা-হইতে লক্ষ যোজন দূরে অবস্থিতি করিতেছে, সে আবার তোমার আপনার হইল কিরূপে? শুদ্ধ কেবল ঘটনা-ক্রমে—দৈবগতিকে—সে তোমার চক্ষুর উপকারে আসিতেছে—এ ভিন্ন আর কিছুই নহে।" ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি যে, আকাশের আপেক্ষিক ব্যবধানকে, বিজ্ঞান, তুমি যদি সত্য সত্যই অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান মনে কর, তবে তুমি এখনও প্রকৃত বিজ্ঞানের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছ; তোমার যখন চক্ষু ফুটিবে তখন স্পষ্ট দেখিতে পাইবে যে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কেহ কাহারো পর নহে।" শুষ্কবিজ্ঞান্ যন্ত্র-ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে জানে না—তাই সে যন্ত্র যন্ত্র করিয়াই অস্থির; তাহার যন্ত্রীভূত চক্ষে—চন্দ্রের মধুর জ্যোৎস্না পদার্থ-বিশেষের কম্পন বই আর কিছুই নহে; মনুষ্যের প্রাণের কথা কণ্ঠনলী-যন্ত্রের উচ্ছ্বাস বই আর কিছুই নহে। কিন্তু যাঁহাদের চক্ষু আছে তাঁহারা দেখিতে পা'ন যে, সূর্য্য চন্দ্র তারকা ওষধি বনস্পতি সকলে মিলিয়া এক অনুপম শোভা উদ্গীরণ করিতেছে; যাঁহাদের কর্ণ আছে তাঁহারা শুনিতে পান যে, সূর্য্য নবানুরাগে উদিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিতেছে "আনন্দিত হও;" চন্দ্র মধুময় জ্যোৎস্নায় তাঁহাদিগকে বলিতেছে আনন্দিত হও;" মুক্ত সমীরণ মৃদু-হিল্লোলে তাঁহাদিগকে বলিতেছে "আনন্দিত হও"; এবং ওষধি বনস্পতি গ্রীবা নত করিয়া মর্ম্মর ধ্বনিতে সেই কথারই পুনঃ পুনঃ অনুমোদন করিতেছে। এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানাং অসম্ভেদায়—লোক ভঙ্গ নিবারণার্থে পরমাত্মা সেতু-স্বরূপ হইয়া সমস্ত ধারণ করিতেছেন, তাই সকলেই সকলের মঙ্গল-ধ্বনিতে সমস্বরে কণ্ঠ মিলাইয়া যোগ দিতেছে। সমস্ত মঙ্গল সমাচার পরম পিতারই প্রেরণা। কিন্তু

যে ভাগ্যবান ব্যক্তি সাক্ষাৎ সেই প্রাণদাতার অমৃত আশ্বাস-বাণী প্রাণের অভ্যন্তরে শুনিতে পা'ন, তিনি সংসার-সমুদ্র নিমেষে তরিয়া যা'ন। তিনি মর্ত্তালোকে থাকিয়াই ব্রহ্মলোকে বাস করেন। তিনি বলেন "এষ ব্রহ্মলোকঃ" এই ব্রহ্মলোক; "তস্মাৎ বা এতং সেতুং তীর্ত্বা" সংসারের সেতু উত্তীর্ণ হইয়া "অন্ধঃ সন্ অনন্ধো ভবতি" অন্ধ যে সে অনন্ধ হয় "বিদ্ধঃ সন্ অবিদ্ধো ভবতি" বিদ্ধ যে—সে অবিদ্ধ হয়, "উপতাপী সন্ অনুপতাপী ভবতি" উপতাপী যে—সে অনুপতাপী হয়; "তস্মাৎ বা এতং সেতুং তীর্ত্বাহপি নক্তং অহরেবাভিনিষ্পদ্যতে" এই সেতু উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি দিবা হইয়া উঠে, "সকৃৎ বিভাতোহ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ" এই ব্রহ্মলোক একবার এক-যে জ্যোতিতে উদ্ভাসিত—চিরকালই সেই জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্।" ব্রহ্মলোক পরমাত্মার জ্যোতির্ম্ময় রাজ্য; তাহাই মনুষ্যের স্বাধীনতার মূল আবাসস্থান। সূর্য্য যেমন তাহার কিরণ-সকলের নিলয়স্থান; ব্রহ্মলোক সেইরূপ সমস্ত জগতের সমস্ত স্বাধীনতার নিলয়স্থান—মুক্তির নিজ নিকেতন।

হে পরমাত্মন্। তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের বন্ধু, তাই তোমার নিকট আমরা প্রার্থনা করিতেছি তুমি আমাদিগকে পাপ তাপ হইতে মুক্ত কর, ও তোমার প্রসন্ন মুখছবি আমাদের আত্মাতে প্রকাশিত কর। সুখে দুঃখে সকল সময়েই তুমি আমাদের পিতা, সকল সময়েই তুমি আমাদের বন্ধু, তুমি আমাদের নিকটে থাকিয়া আমাদের মুমূর্ষু আত্মাতে প্রাণদান কর; তোমাকে না দেখিলে আমরা বিষাদের অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া মোহ-শয্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ি—তুমি দর্শন দান করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

দর্শন-সংহিতা—জ্ঞান-তত্ত্ব।

সিদ্ধান্ত ॥ ২ ॥

জ্ঞানের বিষয়।

আমরা সচরাচর যাহাকে বলি—জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞানের বিষয় তাহা-ছাড়া আরো কিছু অধিক। আশয়-সহকৃত বিষয়ই বিষয়; প্রত্যক্ষের কিম্বা ভাবনার বিষয় একদিকে—এবং জ্ঞাতা আপনি একদিকে—এই দুয়ের সমষ্টিই বিষয়; ইহার কমে বিষয় হইতে পারে না।

প্রমাণ।

জ্ঞানের মূল নিয়ম যাহা পূর্ব্ব সিদ্ধান্তে অটল-রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা এই যে, যে-কোন বস্তু হউক্ না কেন তাহাকে জানিতে হইলে তাহার সঙ্গে আপনাকে না জানিলেই নয়। ইহা যখন স্থির যে, সম্মুখস্থিত বিষয়কে এবং আপনাকে এক-সঙ্গে না জানিলে সম্মুখস্থিত বিষয়কে জানা হইতে পারে না—তখন তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রত্যক্ষের কিম্বা চিন্তার বিষয় একদিকে—এবং জ্ঞাতা আপনি একদিকে, এই দুয়ের সমষ্টিই জ্ঞানের সমগ্র বিষয়—জ্ঞানের প্রকৃত বিষয়; অথবা, আমরা যাহা কিছু জানি তাহাই আশয়-সহকৃত বিষয়; তাহাই প্রত্যক্ষের কিম্বা ভাবনার বিষয় এবং তাহার সঙ্গে আর একটি বস্তু—সেটি জ্ঞাতা আপনি। অতএব জ্ঞাতা আপনি বিষয় মাত্রেরই একটি সমগ্র এবং সার-ভূত অংশ।*

অপিচ; মনে কর যেন—একটি প্রত্যক্ষের কিম্বা ভাবনার বিষয় উপলব্ধি করা হইতেছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে আপনাকে উপলব্ধি করা হইতেছে না। এরূপ ঘটনা প্রথম সিদ্ধান্তের বিরোধী; কেননা, প্রথম

* অর্থাৎ, ঘট+আমি=সমগ্র বিষয়; সুতরাং বিষয়ের একটি অংশ—আমি, ও আর-একটি অংশ ঘট।

সিদ্ধান্ত বলে এই যে, আত্ম-জ্ঞান সকল জ্ঞানেরই সঙ্গের সঙ্গী, ও তাহাকে ছাড়িয়া কোন জ্ঞানই সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু প্রথম সিদ্ধান্ত অটল-রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে—কুত্রাপি তাহার অন্যথা হইতে পারে না; অতএব আমাদের জ্ঞান-সন্নিধানে যাহা যখন উপস্থিত হয়—আমরা আপনারাও তাহার অন্তর্ভূত; আর, জ্ঞাতা-মাত্রেরই জ্ঞানের বিষয়—তিনি-যাহা-কিছু-জানিতেছেন-তাহার-সঙ্গে-তিনি-আপনি—এ-ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

মন্তব্য এবং ব্যাখ্যান।

"তিনি-যাহা-কিছু-জানিতেছেন-তাহার-সঙ্গে-তিনি-আপনি" এই সাতটি শব্দকে সমাস-বদ্ধ করা হইল কেন ॥ ১ ॥

সর্ব্ব-সাধারণতঃ জ্ঞান-মাত্রেরই বিষয় কি, তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিবার জন্য ঐ সাতটি শব্দকে সমাস-সূত্রে গাঁথিয়া এক করিয়া দেওয়া হইল। উহারা যদি পৃথক্ পৃথক্ বিন্যস্ত হইত, তবে, সর্ব্ব-শুদ্ধ ধরিয়া উহারা যে, একটি-মাত্র জ্ঞানের বিষয় প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা পাঠকের তেমন বোধ-সুলভ হইত না। আমাদের কথা কাহারো মনোনীত হউক্ বা না হউক্—কিন্তু কেহ যে, তাহার অর্থ এক বুঝিতে আর বুঝিবেন—সে পথ আমরা রাখি নাই।

বিষয় বলিতে জ্ঞানের সমগ্র বিষয় বুঝিতে হইবে ॥ ২ ॥

বিষয় বলিতে এখানে জ্ঞানের এককালীন সমগ্র বিষয় বুঝিতে হইবে; যে-কোন মুহূর্ত্তে যাহাকিছু আমাদের জ্ঞান-সন্নিধানে উপস্থিত হয়, তাহার আপাদ মস্তক সমস্তটাই বিষয়-শব্দের বাচ্য। আমরা, উপস্থিত বিষয়ের বিশেষ কোন-একটি অংশের প্রতি, অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রা মনঃসমর্পণ করিতে না পারি এমন নহে। উপস্থিত বিষয়ের যে অংশটি বাহ্য-বস্তু, সেই অংশটিতে আমরা বেশী মাত্রা মনঃসমর্পণ করিও বটে। কিন্তু তাহা বলিয়া সেই অংশটিই যে, সমগ্র বিষয়, তাহা নহে; তাহাকে বিষয় না বলিয়া বিষয়াংশ বলাই উচিত। বিষয়ের যে অংশটি বাহ্য বস্তু, দার্শনিক ভাষায় তাহা পরাক্ Objective অংশ, বা পরাচ্য অংশ, বলিয়া অভিহিত হইতে পারে; তদ্ভিন্ন তাহার আর একটি অংশ—যাহার প্রতি সচরাচর আমরা অতি অল্পই মনোনিবেশ করি কিন্তু যাহাকে ছাড়িয়া কোন জ্ঞানই সিদ্ধ হয় না—দার্শনিক ভাষায় তাহা প্রত্যক্ Subjective অংশ বা প্রতীচ্য অংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে; প্রত্যক্ অংশ এবং পরাক্ অংশ, অথবা যাহা একই কথা—প্রতীচ্য অংশ এবং পরাচ্য অংশ এই দুয়ের সমষ্টিই সমগ্র বিষয়। * অথবা

---

* প্রত্যক্ অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে বলে Subjective—পরাক্ Objective।

"তে পরাগ্‌দর্শিনো বালা প্রত্যগ্‌বোধ বিবর্জ্জিতাঃ।
কুর্ব্বতে কর্ম্ম ভোগায় কর্ম্ম কর্ত্তুঞ্চ ভুঞ্জতে ॥"

পঞ্চদশী।

পরাক্‌দর্শী (অর্থাৎ বাহ্য-দর্শী) প্রত্যক্ বোধ শূন্য (অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি শূন্য) বালকেরা ভোগের জন্যই কর্ম্ম করে এবং কর্ম্মের জন্যই ভোগ করে।

প্রাক্ শব্দ হইতে যেমন প্রাচী শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, প্রত্যক্ শব্দ হইতে সেইরূপ প্রতীচী শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রতীচী শব্দের চলিত অর্থ—পশ্চিম দিক্। উদীয়মান সূর্য্যকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইলে পশ্চাৎদিক্ এবং পশ্চিম দিক্ একই হইয়া দাঁড়ায়; পশ্চাৎ শব্দ এবং পশ্চিম শব্দ উভয়ের মূল-ধাতু একই। প্রতীচী শব্দের গোড়ার অর্থ—প্রতিকূলবর্ত্তী; পশ্চিম দিক্ পূর্ব্বদিকের প্রতিকূলবর্ত্তী তাই—প্রতীচী। প্রত্যক্ শব্দের মৌলিক অর্থ এই;—প্রতীপং (অর্থাৎ প্রতিকূলে) অঞ্চতি (গমন করে) ইতি প্রত্যক্। এখন প্রত্যক্ শব্দের দার্শনিক অর্থ কি—তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে;—উপনিষদে আছে—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ আবৃত্ত চক্ষুরমৃতত্ব মিচ্ছন্ ॥" ইহার অর্থ;—

যাহা একই কথা সচরাচর যাহাকে আমরা বিষয় বলি তাহা বিষয়ের একাংশ-ভিন্ন আর কিছুই নহে, যদিচ সেই অংশটির প্রতি আমরা বেশী মাত্রা মনঃ সমর্পন করি। আ-শয়-সহকৃত বিষয়ই প্রকৃত পক্ষে বিষয়, কেন না তাহাই সর্ব্বাঙ্গীন বিষয়। সচরা-চর যাহাকে আমরা বিষয় বলি, তাহাকে বিষয় না বলিয়া বিষয়ের পরাচ্য অংশ বলিলেই ঠিক্ হয়, আর, সচরাচর যাহাকে আমরা আশয়-মাত্র—অর্থাৎ শুদ্ধ কেবল জ্ঞানের আধার-মাত্র—বলি, তাহাকে বিষয়ের প্রতীচ্য অংশ বলিলেই ঠিক্ হয়। কিন্তু সচরাচর আশয় এবং বিষয়ের মধ্যে যেরূপ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ের ঐকান্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটানো হইয়া থাকে, তাহাতে, বিষয়ের মধ্য হইতে আশয় একেবারেই বাদ পড়িয়া যায়; সুতরাং ওরূপ ঐকান্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভ্রমাত্মক এবং স্ববিরোধী, আর, তাহা তত্ত্বজ্ঞান-পথের বিষম একটি বিঘ্ন।*

জ্ঞানের ভিত্তিমূলের প্রতি প্রণিধান-সূত্রে জ্ঞানের বিষয় কিরূপ নূতন আকার ধারণ করে ॥৩॥

জ্ঞানের ভিত্তিমূলের অবধারণ যাহা প্রথম সিদ্ধান্তে হইয়া চুকিয়াছে, তাহাতে করিয়া বিষয়ের অর্থ অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইবারই কথা। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে সেই পরিবর্ত্তনটি স্পষ্টাক্ষরে প্রকটিত হইয়াছে। সচরাচর, বিষয় বলিতে আমরা বিষয়ের একাংশ মাত্র বুঝিয়াই ক্ষান্ত থাকি। শুদ্ধ কেবল যাহা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তা-হাকেই আমরা বিষয় বলি—তাহার সঙ্গে আমরা আপনারা যে জড়িত আছি তাহা আমরা দেখি না। এ-যাবৎকাল বিষয় বলিতে আমরা আত্ম-ব্যতিরিক্ত বিষয়ই বুঝিয়া আসিতেছি; এখন-অবধি বিষয় বলিতে আমরা আত্ম সহকৃত বিষয় বুঝিব।

প্রচলিত গণনা এবং দার্শনিক গণনা ॥৪॥

জ্ঞানের ভিত্তিমূলের বিবেচনা-গতিকে বিষ-য়ের কিরূপ অর্থ-পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা স্পষ্ট রূপে বুঝিতে হইলে, বিষয় এবং আশয়ের প্রচলিত গণনা-পদ্ধতি, আর, তাহাদের দার্শনিক গণনা-পদ্ধতি, দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কিরূপ তাহা দেখা আবশ্যক। বৃত্তান্তটি এই যে, আমরা আপনাকে জানিতেছি এবং চতুর্দিক্স্থ বিষয় সমূহ জানিতেছি; প্রচলিত গণনা-পদ্ধতি এই যে, যে-প্রণা-লীতে আমরা এক বস্তুকে আর আর বস্তু হইতে ভিন্ন বলিয়া গণনা করি, সেই প্রণা-লীতে আমরা আপনা-আপনাকে আর-আর বস্তু হইতে ভিন্ন বলিয়া গণনা করি। দার্শ-

---

স্বয়ম্ভু পরমাত্মা বাহ্য ইন্দ্রিয়-সকলকে বাহির করিয়া দিয়াছেন, তাই তাহারা পরাক্ (Objective world) দর্শন করে। কোন কোন ধীর অমৃতত্ব ইচ্ছা করিয়া বাহির হইতে চক্ষু ফিরাইয়া প্রত্যক্ আত্মাকে দেখিয়া-ছেন।

বাহ্য বিষয় হইতে মনশ্চক্ষু ফিরাইয়া আত্মাকে দেখিতে হয়, এজন্য উপমাচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, বহির্বিষয় সম্মুখবর্ত্তী, আত্মা তাহার প্রতিকূলবর্ত্তী—তাই প্রত্যক্। প্রত্যক্ আত্মা—কিনা জ্ঞানের পৃষ্ঠা-শ্রয়-স্বরূপ (back-ground) আত্মা; Subject কিনা জ্ঞানের ভিত্তিমূল-স্বরূপ আত্মা; উভয়ের মর্ম্মার্থ একই। পরাক্ শব্দ প্রত্যক্ শব্দের প্রতিদ্বন্দী শব্দ, কাজেই তাহার ইংরাজী প্রতি-শব্দ, Objective, এ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। প্রত্যক্ শব্দের আর একরূপ অর্থ করা যাইতে পারে;—প্রতিবেশী বলিতে নিকটতম অধিবাসী বুঝায়; প্রত্যক্ বলিতে জ্ঞানের নিকটতম বিষয় বুঝিলেও তাহার উপরি-উক্ত মর্ম্মার্থের কোন ব্যত্যয় হয় না। এই কারণে Subjective part ইহার অনুবাদ—প্রত্যক্ অংশ অথবা প্রতীচ্য অংশ, Objective part ইহার অনুবাদ পরাক্ অংশ অথবা পরাচ্য অংশ, এইরূপ হইলেই ঠিক্ হয়।

* শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্যের উপক্রমণি-কায় স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "ন তাবদয়ং একান্তেনা বিষয়ঃ" বিষয়ী একান্তই যে বিষয় নহে, তাহা নহে; "অস্মৎপ্রত্যয় বিষয়ত্বাৎ" যেহেতু বিষয়ী অস্মৎপ্রত্য-য়ের বিষয়।

নিক গণনা-পদ্ধতি কিন্তু — আর-এক রূপ। মনে কর তিনটি বহির্বস্তু, স্, ৎ, র্, এই তিনটি হসন্ত অক্ষর দ্বারা সংজ্ঞিত হইল, এবং জ্ঞাতা আপনি "অ" এই অক্ষর দ্বারা সংজ্ঞিত হইল। প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে গণনা করিতে হইলে ঐ তিনটি বহির্বস্তুকে একে একে গণনা করিয়া তাহার পর আপনাকে গণনা করিলেই চলিতে পারে; তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, প্রথম, স্; দ্বিতীয়, ৎ; তৃতীয়, র্; চতুর্থ, অ। কিন্তু দার্শনিক গণনা-পদ্ধতি আর এক প্রকার—তাহা এই;—প্রথম, স্+অ; দ্বিতীয়, ৎ+অ; তৃতীয়, র্+অ; সংক্ষেপে,—প্রথম, স; দ্বিতীয়, ত; তৃতীয়, র; অর্থাৎ (১) অকার-সহকৃত (কিনা আত্ম-সহকৃত) স, (২) অকার-সহকৃত ৎ, (৩) অকার-সহকৃত র্। গণনা-কালে যে মুহূর্ত্তে আমরা "স্" এই বস্তুটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করি সেই মুহূর্ত্তেই তাহা "স" হইয়া দাঁড়ায়—অর্থাৎ অকার-সহকৃত (কি না আত্ম-সহকৃত) হইয়া দাঁড়ায়; তাহার পর যখন সে বস্তুটিকে ছাড়িয়া "ৎ" এই বস্তুটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করি তখন তাহা "ত" হইয়া দাঁড়ায়; এইরূপ, যে-কোন মুহূর্ত্তের যে-কোন জ্ঞান হউক্ না কেন—আত্ম-সহকৃত যাহা-হউক্-একটা-কিছু সেই জ্ঞানের সেই মুহূর্ত্তের সমগ্র বিষয়। যদি, স্, ৎ, র, এই তিনটি বস্তুকে আমরা একই মুহূর্ত্তে যুগপৎ গ্রহণ করি, তাহা হইলে দার্শনিক গণনায়—স+ৎ+র্+অ, এক কথায়—স্ত্র, এইরূপ দাঁড়াইবে। আমি-বাচক ঐ যে, অ, উহা সকল গণনারই বীজ মাত্রা, উহা বিষয়-মাত্রেরই অপরিহার্য্য অংশ, এবং জ্ঞান-মাত্রেরই ভিত্তি-মূল।

দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ॥৫॥

দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত লৌকিক চিন্তার অনবধানতা হইতে প্রসূত, এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায়—দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য জাজ্জ্বল্য-রূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে; তাহা এই;—

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ॥২॥

সচরাচর যাহা বিষয় বলিয়া অবধারিত হইয়া থাকে তাহাই সমগ্র বিষয়; বিষয়ের বিষয়ত্ব শুদ্ধ কেবল উহাতেই পর্য্যাপ্ত। প্রত্যক্ষের বা চিন্তার বিষয়—আশয়-হইতে বিচ্যুত হইলেও, তাহার বিষয়ত্বে কোন দোষ পোঁছে না। আশয়-চ্যুত বিষয়ও বিষয়।

বিষয়ের একটি অংশের প্রতি চক্ষু মুদিয়া তাহার আর-একটি অংশকে তাহার সর্ব্বাংশ মনে করা, লৌকিক চিন্তার অনবধানতা ভিন্ন আর কিছুই নহে; দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে এই লৌকিক ভ্রমটির সংশোধন করা হইল; প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের অনবধানতা—জ্ঞানের ভিত্তি-মূলের প্রতি; দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের অনবধানতা—বিষয়ের অংশবিশেষের (প্রতীচ্য অংশের) প্রতি। প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের ভ্রম এইটি যে, জ্ঞান আপনার ভিত্তি মূলের আশ্রয় ব্যতিরেকেও—আত্ম-জ্ঞান ব্যতিরেকেও—সিদ্ধ হইতে পারে। দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের ভ্রম এইটি যে, বিষয়ের প্রতীচ্য অবয়বটির অবিদ্যমানেও তাহার বিষয়ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে।

প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত অসত্য, তাই, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত অসত্য ॥৬॥

যদি প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত সত্য হয়, তবে দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের ভিত্তি-মূল পর্ব্বতের ন্যায় অটল। কিন্তু প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের বিনিপাতে দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের কোথাও আর দাঁড়াইবার স্থান নাই। জ্ঞানের ভিত্তি-মূলের আশ্রয়-ব্যতিরেকেও—আত্ম-জ্ঞান ব্যতিরেকেও—যদি কোন বিষয়কে জানা কোন জ্ঞাতার পক্ষে সম্ভব-সাধ্য হইত, তাহা হ-

ইলে, বিষয়ের প্রতীচ্য অংশ বাদ দিয়া তাহার পরাচ্য অংশ-টুকু স্বতন্ত্র উপলব্ধি করাও তাঁহার সাধ্য-সুলভ হইত। কিন্তু প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত প্রথম সিদ্ধান্তের বিরোধী —জ্ঞানের একটি স্বতঃসিদ্ধ এবং অবশ্যম্ভাবী সত্যের বিরোধী—এ জন্য তাহা সত্য হইতে পারে না; আর, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, এজন্য তাহাও অসত্য এবং স্ববিরোধী বলিয়া তিরস্কার্য্য। ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আমাদের প্রথম সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য স্বীকার করিতে হইলে, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটিকে কোন মতেই রক্ষা করিতে পারা যায় না। যাঁহারা আমাদের গোড়ার কথাটিতে গ্রীবা অবনত করিয়াছেন, —জ্ঞানের বিষয়-মীমাংসার বেলায় তাঁহারা যে, লৌকিক চিন্তার পক্ষ অবলম্বন করিবেন, সে পথ একেবারেই অবরুদ্ধ; অগত্যা তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের পক্ষ আশ্রয় করিতেই হইবে।

ঐ প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত মনোবিজ্ঞানেরও মত ব্যক্ত করিতেছে ॥৭॥

জ্ঞানের বিষয়-সম্বন্ধে, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত মনুষ্যের একটি প্রকৃতি-সুলভ ভ্রম ব্যক্ত করিয়াই ক্ষান্ত নহে—উহা মনোবিজ্ঞানেরও মত ব্যক্ত করিতেছে। মনোবিজ্ঞান আশয় এবং বিষয়ের মধ্যে কেবল এইরূপ একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংস্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হয় যে, একটি জানিতেছে—আর একটিকে জানা হইতেছে,—প্রথমটি আশয়—দ্বিতীয়টি বিষয়; এ-ভিন্ন, কোথাও সে এরূপ কথা বলে না যে, যখন বিষয়কে জানা হইতেছে তখন সেই সঙ্গে আশয়কেও জানা চাই,—কোথাও এরূপ কথা বলে না যে, জ্ঞাতার সত্তাশ্রয়-ব্যতিরেকে বিষয়ের বিষয়ত্বই সিদ্ধ হয় না। প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তে দেখা গিয়াছে যে, প্রচলিত মনোবিজ্ঞান লৌকিক চিন্তার দলে মিশিয়া জ্ঞানের ভিত্তিমুল দেখিয়াও দেখে না—এইটি মনোবিজ্ঞানের প্রথম সোপান-পংক্তি; দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তে দেখা গেল যে, মনোবিজ্ঞান লৌকিক চিন্তার সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তী হইয়া জ্ঞেয় বিষয়ের প্রধান একটি অংশ দেখিয়াও দেখে না এবং তাহার আর-একটি অংশকে তাহার সর্ব্বাংশ বলিয়া অবধারণ করে—ইহাই মনোবিজ্ঞানের দ্বিতীয় সোপান-পংক্তি। এখানেও মনোবিজ্ঞানের কথা-গুলা গোলমেলে। মনোবিজ্ঞান স্পষ্ট এ কথা বলে না যে, আশয়কে না জানিয়াও বিষয়কে জানা যাইতে পারে; তবে কি? না—"যে জানে সেই আশয় এবং যাহাকে জানা হয় তাহাই বিষয়" এই কথাটির উপর মনোবিজ্ঞান আপনার মতের সমস্ত ভর সংস্থাপন করাতে—প্রকারান্তরে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, যে জানে তাহাকে—অর্থাৎ জ্ঞাতাকে—না জানিলেও বিষয়-জ্ঞান নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে। যাহাই হউক্—পরে পরে ক্রমশই প্রকাশ পাইবে যে, এখনকার প্রচলিত মনোবিজ্ঞান কার্য্যতঃ দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তেরই মতাবলম্বী, আর, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক্—প্রকারান্তরে—মনোবিজ্ঞান দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য অস্বীকার করে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের কথা অতীব সুস্পষ্ট; তাহা এই যে, আশয়-সহকৃত বিষয় ভিন্ন জ্ঞানের বিষয় হইতেই পারে না; এটা কেবল একটা কথার কথা নহে কিন্তু নিতান্তই অবশ্যম্ভাবী—কোন স্থানেই ইহার অন্যথা সম্ভবে না; এবং ইহার বিপরীত পক্ষ নিতান্তই স্ববিরোধী এবং অর্থ-শূন্য।

—

পত্র।

দেওঘর ২০ কার্ত্তিক, ব্রা, স, ৫৭।
৫ নবেম্বর, ১৮৮৬ শাল।

মান্যশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু দুকড়ি ঘোষ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ২২ অক্টোবরের মুদ্রিত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানে আমি ছাড়া দুইটী মাত্র ব্রাহ্ম ও দুইটী ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি আছেন। তাঁহারা আপনার পত্র সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিতে অভিলাষী নহেন।

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ শিক্ষা, স্বভাব ও রুচি অনুসারে এক একটী প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি হেলিয়া পড়া বিচিত্র নহে। কেহ ব্রাহ্ম থাকিয়া বৈদান্তিক ধর্ম্মের প্রতি হেলিয়া পড়েন, কেহ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি, কেহ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি। ক্রিয়া কলাপেও ঐরূপ। কেহ সম্পূর্ণরূপে নূতন পদ্ধতি অনুসারে গার্হস্থ্য ক্রিয়া সম্পাদন করেন, কেহ বা পুরাতন পদ্ধতি অল্পাংশ পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা অনুসরণ করিতে ধর্ম্মের হানি বোধ করেন না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই প্রকার সকল লোকই আছেন। এই প্রকার সকল লোকই এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই সংজ্ঞার সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন, কিন্তু আপনারা যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার ও প্রচারকের কর্ত্তব্য প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ঐ বিশ্বজনীন প্রকৃতি ব্যাহত হইবে।

আপনার প্রেরিত পত্রী পাঠ করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না যে আপনারা ব্রাহ্ম কাহাকে বলেন। আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে বিধি দিয়াছেন "ধর্ম্ম ও জাতি নির্ব্বিশেষে সকল শাস্ত্র ও ব্যক্তির উপদেশ হইতে সাদরে সত্য গ্রহণ করিবে।" আমি জিজ্ঞাসা করি যদি কোন ব্যক্তি আধ্যাত্মিক ধনের জন্য অন্য কোন জাতির নিকট যাইবার আবশ্যক নাই মনে করিয়া, আমাদিগের ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় কেবল হিন্দুশাস্ত্র হইতে সত্য গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে আপনারা ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করিবেন কি না। বোধ হয় করিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে আপনারা বিধি দিতেছেন "ধর্ম্ম ও জাতি নির্ব্বিশেষে সকল শাস্ত্র ও ব্যক্তির উপদেশ হইতে সাদরে সত্য গ্রহণ করিবেক।"

আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে লিখিয়াছেন "ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাতে সম্মিলিত হওয়াই মুক্তি।" কোন ব্রাহ্ম যদি বলেন যে পাপতাপ ও সংসারিক দুঃখ ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্তি পূর্ব্বক চিরকাল ব্রহ্মানন্দ উপভোগই যথার্থ মুক্তি (জীবন্মুক্তি এই মুক্তির অন্তর্ভূত) তাহা হইলে আপনারা তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করিবেন, কিনা? বোধ হয় করিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে আপনারা লিখিয়াছেন "ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাতে সম্মিলিত হওয়াই যথার্থ মুক্তি।"

আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে লিখিয়াছেন "বিবেক বানী ঈশ্বরের ইচ্ছা।" উহাতে ঈশ্বরানুপ্রাণনের কথা কোন স্থানে উল্লেখ করেন নাই। সে বিষয়ে কিছু থাকা কর্ত্তব্য, যেহেতু তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী প্রধান মত। কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিলে ঈশ্বরানুপ্রাণন বুঝায় না। যদি কোন ব্রাহ্ম ঈশ্বর আমাদিগকে জ্ঞানালোক ও ধর্ম্মবল প্রেরণ করেন এবং আমাদিগকে শুভ বুদ্ধিতে নিযুক্ত করেন এমৎ বিশ্বাস করেন তাহা হইলে

তাঁহাকে আপনারা ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করিবেন কি না।

আপনারা প্রচারকদিগের কর্ত্তব্যে লিখিয়াছেন "ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মান ধর্ম্ম-প্রচারকেরা গ্রহণ করিবেন না।" ঈশ্বর-প্রাপ্য সম্মান কাহাকে বলেন? আমাদিগের দেশীয় প্রথানুসারে যদি কোন ব্রাহ্ম ধর্ম্মপ্রচারককে প্রণিপাত করেন তাহা ঈশ্বরপ্রাপ্য সম্মান মনে করেন কি না? যদি কেহ ঐরূপ প্রণিপাত করেন তাহা হইলে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য বলিয়া গণ্য করিবেন কি না? এই বিষয়ে আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিলে ভাল হয়।

আপনারা লিখিয়াছেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক "অনুষ্ঠানে জাতিভেদ প্রশ্রয় দিবেন না।" যদি আমাদিগের ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় কোন একান্ত ব্রহ্মপরায়ণ ধার্ম্মিক ব্যক্তি অনুষ্ঠানে জাতিভেদ পালন করেন তাহা হইলে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য বলিয়া গণ্য করিবেন কিনা? বোধ হয় করিবেন না। কিন্তু অনেক ব্রাহ্ম এমন আছেন যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে সামাজিক বিষয়ে যাহার যেমন বিবেচনা ও রুচি সেইরূপ কার্য্য করিলে ব্রাহ্মের কর্ত্তব্যের কোন হানি হয় না।

আপনারা লিখিয়াছেন যে "ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠানে বিবেক বা নীতির অবমাননা করা হয় তাহাতে যোগ দিবেন না"। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে যদি কোন ব্রাহ্ম আপনার কন্যার চরিত্র পবিত্র রাখিবার জন্য নিজের বিবেক অনুসারে ত্রয়োদশ বৎসরে তাঁহার বিবাহ দেন তাহা হইলে আপনাদিগের দৃষ্টিতে তিনি বিবেক ও নীতির অবমাননা করেন কি? যদি আপনারা বলেন যে অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য এবং অধিক বয়সে বিবাহ দিলে চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষার কোন হানি হয় না তাহা হইলে বক্তব্য এই যে অনেক ব্রাহ্ম এমন আছেন যাঁহারা বলেন অধিক বয়সে বিবাহ দিলে চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা কঠিন হয়, অতএব রজোদর্শন হইলেই বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। আপনারা তাঁহাদিগের বিবেকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবেন কি না?

যদি কোন ব্রাহ্ম স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র পবিত্র রাখিবার জন্য নিজের বিবেকানুসারে গমনাগমন বিষয়ে তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা দিতে অনিচ্ছুক হয়েন তাহা হইলে সে অনিচ্ছা আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ জ্ঞান করেন কি? বোধ হয় করেন, কিন্তু অনেক ব্রাহ্ম এমন আছেন যাঁহাদিগের বিবেক বলে যে নারী-চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা জন্য এরূপ স্বাধীনতা প্রদান অবিধেয়। তাঁহাদিগের বিবেক প্রতি আপনারা সম্মান করিবেন কি না?

যদি আমাদিগের প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় কোন একান্ত ব্রহ্মপরায়ণ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণবংশীয় ব্রাহ্ম কেবল কৌলিক রীতির অনুরোধে পৌত্তলিকতার সহিত কোন সংশ্রব না রাখিয়া আপনার পুত্রের উপবীত দেন তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন কি না?

এইরূপ আপনাদিগের প্রেরিত ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার ও প্রচারকদিগের কর্ত্তব্য ধরিয়া শত শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে এইরূপ কোন ব্রাহ্মের মত হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলা যায় কি না, এবং এরূপ কার্য্য করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য বলা যায় কি না? যদি কোন বিশেষ সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট মত অথবা কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ না করিলে কোন ব্যক্তি ব্রাহ্ম নহেন অথবা ব্রাহ্ম

ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য না করেন বলা যায় তাহা হইলে সাম্প্রদায়িকতার একশেষ হয়। এইরূপ সাম্প্রদায়িকতা অন্য ধর্ম্মে পোষায়, ব্রাহ্মধর্ম্মে পোষায় না। রামমোহন রায় ব্রাহ্ম শব্দের সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি ঐ শব্দের "ব্রহ্মের উপাসক" এই অর্থ করিতেন। সামাজিক বিষয়ে কোন ব্যক্তির যে মত হউক না কেন, কোন প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি কোন ব্যক্তির পক্ষপাত থাকুক না কেন, নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরের উপাসক হইলেই তিনি তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিতেন। আমরা যদি ব্রাহ্ম শব্দে আর কিছু বুঝি তাহা হইলে ঐ শব্দের ব্যবহার আমাদিগের পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ঐ শব্দের সৃষ্টিকর্ত্তা যে অর্থে উহা ব্যবহার করিতেন আমরা সেই অর্থ প্রসারণ করিতে পারি, সঙ্কোচ করিবার কোন অধিকার নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজ যতদূর পারেন ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা রক্ষা করিতেছেন। জাতি, সম্প্রদায়, মত নির্ব্বিশেষে যে কেহ নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করিতে অভিলাষী তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনা করিতে পারেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অনুষ্ঠানপদ্ধতি আছে বটে কিন্তু যে ব্রাহ্মেরা তাহা অনুসরণ না করেন, নিজের বিবেকানুসারে প্রাচীন পদ্ধতি কেবল আচার মাত্র জ্ঞান করিয়া তদনুসারে গার্হস্থ্য ক্রিয়া সম্পাদন করেন তাঁহারা ব্রাহ্ম নহেন এমত আমরা বলি না। আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজ আছে, কিন্তু তাহা বীজ মাত্র। প্রত্যেক ব্রাহ্ম আপনার জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে তাহা বিকশিত করিয়া লইতে পারেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবের সঙ্গে মিল থাকিলেই হইল। উদারতা বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রকৃতি অনেকটা আদি ব্রাহ্মসমাজের ন্যায়। যদি আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা রক্ষা করিতে চাহেন তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রকৃতি অব্যাহত রাখুন। যদি কোন বিশেষ মত আপনারা প্রচার করিতে চাহেন আপনাদিগের মধ্যে যাঁহারা সেই বিশেষ মতাবলম্বী (কোন বিশেষ মতের অনুবর্ত্তী লোক ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অল্পই পাইবেন কারণ আমি দেখিতেছি এক একটা ব্রাহ্ম এক একটী সম্প্রদায়) তাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অব্যাহত রাখিয়া একটী প্রচার সভা সংস্থাপন করিয়া তাহাকে "প্রচার সভা" এই মাত্র নাম দিয়া সেই বিশেষ মত প্রচার করিতে পারেন তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সার ও প্রচারকের কর্ত্তব্য যাহা নির্দ্ধারণ করিবেন তাহা থাকিবে না। অবিলম্বে আপনাদিগের মধ্যে হইতেই এক দল উঠিয়া তাহা পরিবর্ত্তন করিবে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন চলিবে। কমিটি সবকমিটির অবধি থাকিবে না। অতএব ব্রাহ্মসমাজকে মতবদ্ধ (Creed-bound) করিতে চেষ্টা করা বৃথা, বিশেষতঃ আপনারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে এরূপ শৃঙ্খল-বদ্ধ করা উচিত হয় না,তাহাতে সকল প্রকার ব্রাহ্মের স্থান পাওয়া কর্ত্তব্য, আসল বিষয়ে মিল্ থাকিলেই হইল।

নিবেদক

শ্রী রাজনারায়ণ বসু।

পুঃ উপরে যে সকল আধ্যাত্মিক অথবা সামাজিক কথা উত্থাপিত হইল সেই সকল বিষয়ে আমার নিজের মত কিছু প্রকাশ করিলাম না, যাহা বলিলাম তাহা সাধারণতঃ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলাম।

এই পত্রের প্রাপ্তি সংবাদ দিলে এবং তাহা আপনাদিগের ২০ নবেম্বরের সভায় পাঠ করিলে পরম বাধিত হইব।

বিবিধ।

আমরা গত ভাদ্র মাসের তত্ত্ববোধিনীতে সালঙ্কার সত্যের অপকারিতা দেখাইবার নিমিত্ত একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। পুনা প্রবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় গত আশ্বিন মাসের ধর্ম্মপ্রচারকে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন পৌরাণিকেরা রূপকচ্ছলে যে সমস্ত নীতি শিক্ষা দিয়াছেন তদ্দ্বারা লোকের যথেষ্ট উপকার হয় ইত্যাদি। দীননাথ বাবু আমাদের প্রবন্ধ বোধ হয় সাভিনিবেশ দৃষ্টিতে দেখেন নাই। তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ লোকের কদাচ এরূপ ভ্রম হইত না। পুরাণে এবং অন্যান্য কাব্যে ধ্রুবোপাখ্যানাদির ন্যায় রূপকের আশ্রয় লইয়া অনেক উচ্চ নীতির উপদেশ দ্বারা যে জগতের উপকার হইয়াছে আমরা তাহা অস্বীকার করি না। রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ পাঠে বুঝা যায় যে নীতি গল্পের মধ্যে থাকিলে লোকের হৃদয়স্পর্শী হয় কিন্তু আমাদের বক্তব্য অন্য প্রকার। আমরা কহিয়া ছিলাম উপনিষদ যেরূপ সরল ভাব ও ভাষায় ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন পুরাণ সেরূপ পারেন নাই। তিনি রূপক বা অলঙ্কারের আশ্রয় লইয়া এই হইয়াছে যে লোকে অগ্রে সেই অলঙ্কারের আভায় মোহিত হইয়া যায়। তাহার অভ্যন্তরে কি যে সত্য আছে তাহার অনুসন্ধানে আর তাহার অবসর হয় না। আমরা এই কথার উল্লেখ করিয়া রাধা কৃষ্ণের মূর্ত্তিকে প্রমাণস্থলে আনিয়াছিলাম এবং এই প্রচ্ছন্ন সত্যে লোকের যে কতদূর অনিষ্ট হইয়াছে তাহাও দেখাইয়াছি। আমরা এস্থলে দীননাথ বাবুর প্রতীতির নিমিত্ত প্রাচীন গ্রন্থ হইতে এইরূপ আরও একটী প্রচ্ছন্ন সত্যের নিদর্শন দেখাইতেছি। বাস্তব ইহা দ্বারা লোকের বুদ্ধি মোহ জন্মিবার সম্ভাবনা আছে কি না তিনি আপনিই বুঝিয়া দেখুন। বিষ্ণুস্মৃতিতে একস্থলে ব্রহ্মধ্যান অভ্যাস করিবার উপদেশ আছে। গ্রন্থকার প্রথমে স্পষ্ট কথায় বলিলেন আত্মাতে ঈশ্বরকে না দেখিলে মুক্তি নাই। কিন্তু এই ব্রহ্মধ্যান সহজ নয়। এই বুঝিয়া তিনি প্রথমে কহিলেন স্থূল পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম আকাশে সমাধি অভ্যাস কর তাহা হইলে ব্রহ্মধ্যানে সিদ্ধ হইবে। অর্থাৎ তিনি মনে করিয়া ছিলেন স্থূল পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ভূতে সমাধি অভ্যাস সহজ হইবে। কারণ পৃথিবী অপেক্ষা জল ব্যাপক, জল অপেক্ষা তেজ ব্যাপক, তেজ অপেক্ষা বায়ু ব্যাপক, বায়ু অপেক্ষা আকাশ ব্যাপক। এই ব্যাপক আকাশকে যে চিত্তে ধারণ করিতে পারিবে সে এই পঞ্চভূতের অতীত অথচ ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তী অরূপী ব্যাপক ব্রহ্মকে ধ্যান করিতে পারিবে। প্রথমে এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি ধ্যানসৌকর্য্যের নিমিত্ত আবার কহিলেন যদি ইহাতেও সমাধি অভ্যাস না হয় তাহা হইলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিকে ধ্যান করিবে। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে শঙ্খ চক্রাদি আকাশাদি ভূতের স্মারকচিহ্ন। যিনি এই চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি অবলম্বনে ধ্যান অভ্যাস করিবেন তিনি যথাবৎ মূর্ত্তিমাত্রকে ধ্যান করিলে চলিবে না কিন্তু যে ব্রহ্ম এই আকাশাদি ভূতের অতীত অথচ ইহাতে ব্যাপ্ত এই বিষ্ণুমূর্ত্তি অবলম্বনে সেই ব্যাপক ব্রহ্মকেই ধ্যান করিতে অভ্যাস করিবে। এখন দীননাথ বাবু বুঝিয়া দেখুন এই অলঙ্কারে প্রচ্ছন্ন সত্য দ্বারা জগতের অনিষ্ট আছে কি না। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নিরাকার সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের ধ্যান। তিনি প্রথমে স্পষ্টই বলিলেন আপনার আপনার আত্মাতে এই ব্রহ্মদর্শন

না হইলে মুক্তি নাই। কিন্তু তিনি সর্ব্বসাধারণের এই ধ্যান সুগম হইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এবং যাহাতে ক্রমশ ইহা লোকের অভ্যস্ত হয় সাধ্যানুসারে তাহার উপদেশ দিতেও ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু ফল দাঁড়াইল কি? ভবিষ্যতে লোকেরা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিল না। তিনি যে অভিপ্রায়ে শঙ্খচক্র গদাধারী বিষ্ণুমূর্ত্তিকে ধ্যান করিতে বলিয়াছেন সে দিকে সাড়ে পনর আনা লোক যাইতে পারিল না। তাহারা সেই স্থূল মূর্ত্তিতে বদ্ধ হইয়া রহিল এবং ঘরে ঘরে সেই স্থূল মূর্ত্তিরই আরাধনা হইতে লাগিল। এই জন্য আধ্যাত্মিক রূপক নামক প্রস্তাবে বলিয়া ছিলাম যিনি সত্যের দেহে এই অলঙ্কার দেন ইহা দ্বারা তাঁহার কোন অনিষ্ট হয় না. হয় কেবল পরবর্ত্তী লোকদিগের। ইহারা এই অলঙ্কারের প্রভায় অগ্রে মুগ্ধ হইয়া পড়ে, তাহার অভ্যন্তরে কি যে সত্য আছে তাহার অনুসন্ধানে আর তাহাদের অবসর থাকে না। এইটুকুই ইহার অনিষ্টকারিতা। আমরা এই সম্পর্কে আধ্যাত্মিক রূপকে অনেক কথা বলিয়াছি। তাহার পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। কিন্তু দীননাথ বাবুকে একটী কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করিতে চাই। হিন্দুজাতি যেরূপ ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে বুঝিয়াছিল জগতে অদ্যাপি আর কোন জাতি সেরূপ বুঝিতে পারে নাই। তবে যে ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে মূর্ত্তিপূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং মূর্ত্তিই মুক্তিদাতা বলিয়া যে লোকের মনে বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে তাহাতে প্রাচীন ঋষিদিগের দোষ নাই, দোষ পরবর্ত্তী লোকদিগের। তাঁহারা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া ধর্ম্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা বুঝাইয়াছেন আমরা অজ্ঞান ও কুসংস্কারে উপহত; সহজে তাহা বুঝিবার চেষ্টা পাই না এবং যেরূপ সাধনে ব্রহ্মলাভের উপদেশ দিয়াছেন প্রাণের আশুতৃপ্তির অনুরোধে তাহার দিকে ঘেঁসি না, এই জন্য স্থূল উপাসনা এদেশে আস্পদ লাভ করিয়াছে। কিন্তু এদেশে বিপ্লবের উপর বিপ্লবেও সেই সমস্ত ব্রহ্মবাদী ঋষি এখনও আধ্যাত্মিক জীবনে জীবিত। আমরা এখনও যদি সরল মনে তাঁহাদের পদতলে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করি তাহা হইলে এদেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা আর থাকে না। ঘরে ঘরে আবার নিরাকার ব্রহ্মের পূজা প্রবর্ত্তিত হয়।

ভক্তিভাজন বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বাবুর ইচ্ছা মহা হিন্দুসমিতি নামে এক হিন্দুসাধারণ সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। হিন্দুর মধ্যে সাকার ও নিরাকার উভয় প্রকার উপাসকই এই সমিতিতে মিলিত হইতে পারেন। ধর্ম্ম বিষয়ে স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা হিন্দুদিগের জাতীয় ভাব উদ্দীপন করা এবং সাধারণত শরীর মন নীতি রাজনীতি কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন করা এই সভার প্রধান লক্ষ্য হইবে। রাজনারায়ণ বাবু যে প্রণালীতে হিন্দুজাতির এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সম্পাদনের আশা করিয়াছেন তাহা, ফলে কত দূর হইবে অবশ্য তাহা একটী চিন্তার বিষয় কিন্তু আমরা তাঁহার এই উচ্চ আশাকে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রশংসা করি। এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে আমাদের অনেক উৎকর্ষ ক্ষয়োন্মুখ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। এখন স্বদেশানুরাগী চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই তাহার রক্ষা বিষয়ে প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক। আদি ব্রাহ্মসমাজ জন্মাবধি এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া আছেন। বৃদ্ধ হিন্দু রাজনারায়ণ বাবুর এই আশা যদি ফলবৎ হয় তাহা হইলে এই আদি ব্রাহ্মসমাজেরই অনেকটা উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

এই ঘোর বিপ্লবের সময় সভা সমিতি বা যে কোন উপায়ে হউক যিনি এই হিন্দুজাতির বিনাশোন্মুখ ধর্ম্ম রীতি নীতি রক্ষার সূচনা করিবেন তিনি বাস্তবিক এ দেশের একজন পরম বন্ধু। অনেকের সংস্কার ইংরাজী শিক্ষা দেশের উপকার ও অপকার দুই করিতেছে। আমরাও তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই বৃদ্ধ হিন্দুর ন্যায় যিনি ইংরাজী ভাষায় উচ্চ শিক্ষা পাইয়া স্বদেশানুরাগের এইরূপ উচ্চ আশা হৃদয়ে ধারণ করেন আমরা তাঁহাকে রত্নের ন্যায় মস্তকে বহন করিতে প্রস্তুত আছি। মহা হিন্দু সমিতিতে হিন্দু সাধারণের হৃদয়ে কিরূপ ভাব মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইবে রাজনারায়ণ বাবু তাহার একটু নিদর্শন দিয়াছেন। আমরা আগ্রহের সহিত নিম্নে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"হিন্দু নাম আমরা কখনই পরিত্যাগ করিতে পারি না। হিন্দু নামের সঙ্গে কত হৃদয়গ্রাহী ও মনোহর ভাব জড়িত রহিয়াছে। হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই সরস্বতী-নদী-তীর-বাসী আদিম আর্য্যদিগের বরণীয় মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়, যাঁহারা ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের নিকট সম্বন্ধ অনুভব করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—

"ত্বং হি নো পিতা বসো ত্বং হি নো মাতা," "সখা পিতা পিতৃতমঃ পিতৃণাম্ "স্বাদ্ব সখ্যং সাধী প্রণীতি" "ত্বং অস্মাকং তবাস্মি।"

"তুমি আমাদিগের পিতা, তুমি আমাদিগের মাতা," তুমি সখা, পিতা, পিতৃগণের মধ্যে পরম পিতা," "তোমার বন্ধুতা অতি সুস্বাদু,""তুমি আমাদিগের আমরা তোমার।' হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে আমাদিগের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই তিত্তির ঋষির বরণীয় মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যিনি বলিয়া গিয়াছেন,

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যোবেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।"

যিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে আপনার হৃদয়াকাশে স্থিত বলিয়া মানেন, তিনি সেই জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত সকল কামনা উপভোগ করেন।" হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদিগের মনচক্ষু সম্মুখে সেই বরণীয় আর্য্যমূর্ত্তি মাণ্ডুক্য আসিয়া উপস্থিত হয়েন, যিনি বলিয়াছেন, "শান্তং শিবমদ্বৈতং" তিনি শান্তস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ এবং অদ্বৈত স্বরূপ।" যখন আমরা এই হিন্দু নাম উচ্চারণ করি, তখন আমাদিগের স্মৃতিক্ষেত্রে ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরজটাকলাপধারী ব্যাসের বরণীয় মূর্ত্তি আসিয়া আবির্ভূত হয়, যিনি বলিয়াছেন, "আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ।" "আপনার মঙ্গলের যাহা প্রতিকূল, পরের প্রতি তাহা করিবে না।" যখন আমরা এই হিন্দু নাম উচ্চারণ করি, তখন আমাদিগের মনশ্চক্ষু সম্মুখে মধুরস্বভাব অথচ স্বাধীনাত্মা বশিষ্ঠের বরণীয় মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যিনি বলিয়াছেন,

"যুক্তিযুক্তং উপাদেয়ং বচনং বালকাদপি অন্যৎ তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা।"

"বালক যদি যুক্তিযুক্ত বাক্য বলে, তাহা উপাদেয়; আর স্বয়ং ব্রহ্মা যদি অযুক্তিযুক্ত বাক্য বলেন, তাহাও তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।" হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে, আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই নবীন দুর্ব্বাদলশ্যাম ধীর প্রশান্ত-মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়েন, যিনি পিতৃসত্যপালন নিমিত্ত চতুর্দ্দশ বৎসর কাল অরণ্যে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন ও সংযত মনের এবং পরস্পর বিপরীত গুণের সামঞ্জস্যের সর্ব্বোত্তম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে, আমাদের মানসক্ষেত্রে সেই নন্দের নন্দন

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হয়েন, যিনি জ্ঞানীর শিরোমণি, প্রেমিকের শিরোমণি, যিনি ধর্ম্মবক্তার প্রধান, যাঁহার কথিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সকল কালের সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুকর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মান্য হইয়া আসিতেছে এবং বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার কালেও ভারতবর্ষে ও য়ুরোপখণ্ডে উভয়ত্রই স্বীয় প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছে; যিনি ভক্তি ও প্রেমধর্ম্মের সংস্থাপক অথচ রাজনীতিজ্ঞ ও কৌশলীদিগের চূড়ামণি, যাঁহার বিচিত্র মহিমা কবীন্দ্র সকল স্বীয় স্বীয় রচিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থে যথোপযুক্তরূপে বর্ণন করিতে পরাস্ত হইয়াছেন, যাঁহার পরমাদ্ভুত চরিত্র মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ সূক্ষ্মরূপে ব্যবচ্ছেদ করিতে চিরকালই হারি মানিয়াছেন ও মানিতেছেন। হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে, আমাদিগের মনশ্চক্ষু সম্মুখে যুধিষ্ঠির আসিয়া আবির্ভূত হয়েন, যাঁহার নাম ভারতবর্ষে ধর্ম্ম শব্দের প্রতিবাক্যস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে, সেই অলোক-সামান্য পুরুষ আমাদিগের মনশ্চক্ষু সম্মুখে উপস্থিত হয়েন, যিনি যুধিষ্ঠিরকে আপনার মৃত্যুসাধনের উপায় বলিয়া দিয়া অসাধারণ মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং শরশয্যার কঠোর যন্ত্রণার মধ্য হইতে পাণ্ডবদিগকে অশেষ অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ নাম উচ্চারিত হইলে, সেই মহামনা রাজর্ষি জনক আমাদিগের স্মৃতিক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েন, যিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী থাকিয়াও, এক মুহূর্ত্ত অধ্যাত্ম যোগ হইতে স্খলিত হইতেন না। এই নাম উচ্চারণ করিলে, মহাত্মা পুরুরবাকে স্মরণ হয়, যিনি এলেক্‌জাণ্ডারের নিকট শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া বন্দীভাবে নীত হইলে এবং এলেক্‌জাণ্ডার "তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, "এক রাজা অন্য রাজার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, সেইরূপ করিবেন" এই উত্তর দিয়াছিলেন। হিন্দু নাম কি মনোহর। ঐ নাম কি আমরা কখন পরিত্যাগ করিতে পারি? এই নাম ঐন্দ্রজালিক প্রভাব ধারণ করে; এই নাম দ্বারা বাঙ্গালি, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, রজপুত, মাহারাট্টা, মান্দ্রাজী—সমস্ত হিন্দুগণ একহৃদয় হইবে; তাহাদিগের সকলের এক প্রকার উন্নত কামনা হইবে; সকল প্রকার স্বাধীনতালাভ জন্য তাহাদের সমবেত চেষ্টা হইবে। অতএব যে পর্য্যন্ত আর্য্য-শোণিতের শেষ বিন্দু আমাদিগের শিরায় প্রবাহিত হইবে, সেই পর্য্যন্ত আমরা এ নাম পরিত্যাগ করিব না। * * * *

* * * * *

মহদ্বাক্য।

(২৬)

মঙ্গল সাধনই ধর্ম্মের প্রাণ।

(২৭)

উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রধান সহায় কি? সত্যানুসন্ধিৎসা।

(২৮)

যে ভয়ের বশীভূত সে ঘোর দুঃখের ভাগী। ঈশ্বরের রাজ্যে ভয় করিবার কিছুই নাই।

(২৯)

ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে স্বর্গে যাইতে হয় না, স্বর্গ তাঁহার হৃদয়ে আপনা হইতেই অবতীর্ণ হয়।

(৩০)

ধার্ম্মিক ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রসাদের অধিকারী হয়েন এবং তাঁহা কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়েন।

(৩১)

জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ জন্য ধনোপার্জ্জন, ধনোপার্জ্জনের জন্য জীবন নহে। এই সহজ সত্যটী কত লোক ভুলিয়া রহিয়াছে।